ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী-16
কর্তৃক প্রকাশিত ও নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-4 দ্বারা মুদ্রিত।

এক

পরশুও লোকটি এসেছিল বাসন্তীদের বাড়ীতে। এবার নিয়ে সে তিনবার এসেছে ওদের বাড়ী, মনে পড়ে যায় বাসন্তীর। লোকটি যে কে, এখনও ওর বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি সে। মাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি? নাঃ দরকার নেই, তাহলে মা আবার কত কি ভেবে বসবেন। ভাববেন—এত কৌতুহল কেন? তাহলে কি ওর পছন্দ হয়েছে? এরকম সন্দেহ হওয়া তো অমূলক নয়! লোকটা—না, ছেলেটা কোথা থেকে আসে? রাইডিঙীয়া থেকে? না কি গাঙচিলা? আচ্ছা, সে কি জলমৈ গ্রামের বাতুল বায়েনের কেউ? তা নাহলে, খনপীয়া গ্রামের মুচুকন্দ সাতোলার ছেলেও তো হ'তে পারে! সে যেখানকারই হোক না কেন, অন্ততঃ আমাদের সোনাই নদীর এপারের নয়। সোনাইর উত্তর দিকের পারের গ্রামগুলো ওর একে একে মনে আসে—জলমৈ গ্রাম, গাঙচিলা, রাইডিঙিয়া, ডেওরা, কুঁজী, চাবুকধরা, কছুয়া আঁটি। আরও কত কি গ্রাম আছে। ওর দাদা ব্যবসাদার, তাই ওদের বাড়ীতে অনেক লোকের যাতায়াত। ওর দাদার কত রকম লোকের সঙ্গেই তো চেনা জানা। জুবেদালী মুন্সীর সঙ্গে ওর যেমন খাতির, কুঁজী গ্রামের বলুকা কলিতার সঙ্গেও তেমনি হৃদ্যতা। এই ছেলেটির সঙ্গে যে ওর দাদা ভোগরামের বেশ ভালই আলাপ আছে তা অনুমান করতে পেরেছে বাসন্তী।

তার কথা—যার নামধাম কিছুই জানে না, এ হেন সেই পুরুষটির কথা, আজকে ও এত করে ভাবছে কেন? ওর লজ্জাও করছে

ভাবতে। হঠাৎ ওর মনে কিসের যেন একটা ঢেউ খেলে যায়। গামছাতে ফুল তোলার এখনও অনেকটা বাকী, গাঙচিলার রুকিণী মাসীর বিয়ের নিমন্ত্রণে একদিন আগে যাবে না কি দুচারদিন আগেই গিয়ে পৌঁছবে—এসব কথা তো সকালেই ওর ভাবা উচিত ছিল—কিন্তু একবারও কেন মনে এল না, আশ্চর্য! অতর্কিতে, গোপনে সেই ছেলেটার কথাই যেন ওর মনকে তোলপাড় করে তুলছে। জোয়ারের জলে নৌকার দাঁড় টেনে রাখা যায় না, মনটাকেও তেমন জোর করে বেঁধে রাখা যায় না। কার মুখে যেন ও শুনেছিল যে কাছমারী ডোবার তল খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনি মনের গভীরেও পৌঁছান যায় না। অপরিচিত পুরুষ একজনের প্রতি হঠাৎ এরকম আকর্ষণে ওর যুবতী মনটা আনচান করে উঠল। বাড়ীর সমস্ত কাজকর্ম করা, রোজ ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, তাঁত চালানো আর দিনে দুবেলা ঢেঁকীতে ধান ভেনে আশেপাশের লোককে ওর উচ্ছল যৌবনের উদ্দামতা প্রকাশ করা। এই আটসাট চঞ্চল দেহটিতে আজ যত রাজ্যের আলস্য এসে ভর করেছে। তাঁতঘরের মাকুটা আজ অকম্পিত। তাঁত চালানো চরণের ছন্দ থমকে রয়েছে।

অনেকটা বেলা হয়ে গেল। রোদ্দুর গায়ে লাগছে। এখনও অনেক কাজ বাকী। চালগুলো তো আর একবার ভানার দরকার ছিল। হাঁসগুলোকে এখনও ছাড়া হয়নি চরবার জন্য, তারপর হাঁসের ঘরটাও পরিষ্কার করতে হবে। ঘরের সামনের মাটির দেওয়ালটা এখনও নিকোনো হয়নি। বাড়ীর অন্য সকলেই ব্যস্ত। ভাইপো-ভাইঝি দেউকন আর চিকুনী উঠোনে 'কানি-মুনি-খাই' খেলা খেলছে। হাত দুটো বাড়িয়ে 'কানি-মুনি-খাই' য'তে আছে ত'তে পাই' বলে গোল হয়ে ঘুরে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছে। ওর দাদা ভোগরাম সকালবেলাই সাইকেলে দাড়িপাল্লা বেঁধে নিয়ে ঢলপুরীয়াতে চলে গেল। বৌদি হয়তো পিছন দিকের উঠোনের দড়িতে কাপড় মেলছে। বুড়ী মা বৈঠকখানায় গুটিসুটি হয়ে বসে গুণ্ গুণ্ করছেন—ভাল ভাল, ভাল ভাল, ভাল নাচে মদন গোপাল…।

ভাড়ারের সামনে জ্বালানী কাঠ জড় করা। বাসন্তী তার উপরে বসে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। রাস্তার সামনে দিয়ে একজন বুড়ো লোককে যেতে দেখে দেউকন আর চিকুনীটা দুষ্টুমি করে চেঁচাচ্ছে—'বাঁহর মুঢ়া বগরীর গুড়া, ক'রপর ওলালহি চকু চেলোয়া বুঢ়া' অর্থাৎ বাঁশের মুড়ো, কুলের গুড়ো কোত্থেকে এসেছে চোখ পাকানো বুড়ো···। সঙ্গে সঙ্গেই ওর বৌদির গলা বাসন্তীর কানে এল—তোদের বড় বাড় বেড়েছে না ? রাস্তার লোককে এমনি করে ভ্যাঙানোর মজা একদিন টের পাবি।

কিছুক্ষণ বাদেই বাসন্তীর বৌদি ওর কাছে এসে ওকে একবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। ওর গায়ের চাদরটা ঝুলে মাটিতে পড়েছে, সেটাকে টেনে নিয়ে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বিরক্ত প্রকাশ করে বলে—বাসন্তী, হল কি তোর ? চুপচাপ বসে আছিস ! এদিকে যে কত বেলা বয়ে গেল, খেয়াল আছে তোর ? সব কাজই তো পড়ে আছে !

লজ্জা পেয়ে বাসন্তী উঠে দাঁড়ায়। বৌদি হয়তো ওর মনের কথা বুঝতে পেরেছে। এরকমভাবে কাজকর্ম ফেলে রেখে বসে থাকতে ওর বৌদি বাসন্তীকে আগে দেখেনি কখনও। দোষ ঢাকতে বাসন্তী নিজে থেকেই বলে ওঠে—আজ সকাল থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই। মাথাটা ভার ভার লাগছে !

সুযোগ পেয়ে বৌদি ঠাট্টা করতে ছাড়ল না—তাই বুঝি ? আমি ভেবেছি হয়তো কোন মনের অসুখ। আজকালকার মেয়েদের আবার মনের অসুখটাই বেশী কিনা। উঠ্‌তি বয়সের ধর্মই এই।

—কেন ঠাট্টা করছ বৌদি ? আজকাল তোমাকে কিছু বললে তুমি অন্য রকম ভাবো।

—তোর আর আমাকে নতুন করে কিছু বোঝাতে হবে না, আমি যা বুঝেছি, তাই ঠিক।

—কি বুঝেছ ?

—বুঝেছি, তুই এখন যুবতী আর আমরা বোকা। এর চেয়ে আর বেশী কি বুঝবো ?

কথাগুলো বলে বৌদি হাসতে থাকে। সে হাসিতে বাসন্তী যোগ দিতে পারে না। ওর বুকের মধ্যে কি রকম শির্‌শির্ করে ওঠে।

—দেউকনদের জামাগুলো কাচা হয়নি বৌদি ?

—না, দরকার নেই। আজ তোকে রেহাই দিচ্ছি, অন্যের বাড়ীর বৌ হয়ে গেলে, তখন কি আর এত করে আমার জন্য ভাববার সময় পাবি ?

—ইস্ বৌদি·········

—যা হয়েছে, তোর আর অত আদিখ্যেতা করতে হবে না।

এবার ওর বৌদি বাসন্তীর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘরের ভিতরে চলে গেল। ভিতর থেকে বাসন্তীর কানে এল বিয়ানামের* সুর—'ফুল আছে ফুলি, কদম আছে হালি, কিয় আইদেউ চিন্তা করা রাম নাহে বুলি'·····

অর্থাৎ ফুল রয়েছে ফুলে, কদম আছে হেলে, কেন তুমি চিন্তা কর রাম আসছে না বলে।

বাসন্তীর আর বুঝতে বাকী থাকে না যে ওর বৌদি ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যই ঘরের ভিতরে গিয়ে বিয়ানাম গাইছে। আজকে বৌদির জন্য ওর মনটা কেমন করে। এত স্নেহপ্রবণ আর কত আমুদে এই মানুষটি, দুঃখ বলে যেন কোন বস্তুই নেই। কেনই বা দুঃখ করতে যাবে ? ভোগরাম ওকে এত স্নেহ করে, এত ভালবাসে। কিন্তু এই বৌদিই আবার অন্য লোকের মনের কথা যে এত সহজে ধরতে পারে তা আজকেই টের পেল বাসন্তী।

ওদের বাড়ীর পিছন দিকের সব্জি বাগানটা ফলেফুলে ভরা। বাগানে প্রায় আড়াই কুড়ি পান সুপুরীর গাছ। কালোজামের গাছ দুটো। গাঙচিলার থেকে নিয়ে আসা সেই নারকল গাছ দুটোতে

*বিয়ানাম—কনের বিয়ের সময় এই গান গাওয়া হয়।

এবার ফলন ধরেছে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাগান। এত পরিষ্কার যে ফুঁ দিয়ে ভাত খাওয়া যায়। মন খারাপ হলে বাসন্তী প্রায়ই সজ্জিবাগানে এসে বসে। একটা খুন্তি নিয়ে আলু-কচু আর আদা-হলুদের গোড়া খুঁড়তে থাকে। আজকেও এই বাগানে এল। ওকে দেখে কাঠবেড়ালী মাথা নেড়ে ওকে যেন ভেঙচে দিয়ে এক দৌড়ে সুপুরী গাছের গোড়ার দিকে চলে যায়। পুলিশের মত টুপী পরা কাঠঠোকরা পাখীটা এতক্ষণে থেকেরা* গাছে গুটিসুটি হয়ে বসল। সেও কিছুক্ষণ ওর কাজ বন্ধ করে চীৎকার করে আবার চুপ করে বসে রইল। ছোটকাকার বাগানের বাঁশঝাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখে বাসন্তী। বেড়ালের মত একটা জন্তু, গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাসন্তীর মনে হ'ল, এরাও যেন ওর মনের কথা টের পেয়েছে। পশুপাখী আগে থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারে। এরা যে ওর সব কথা জানতে পেরেছে এটা আশ্চর্যের কিছুই নয়। আর তাইতো এরা ওকে এমনভাবে সম্ভাষণ করেছে। ও যে কি সব ভাবছে? এইসব আবোল-তাবোল কথা লোকে ভাবে নাকি? ও পাগল হয় নি তো? আদতে এসব কথার কোনই মানে নেই হয়তো।

কিন্তু সোনাই নদীর মেয়েরা এমনি করেই ভাবে। এর আশে-পাশের ঝোপ-ঝাড়, গাছ-গাছড়া, পাখী-প্রাণী আর বিলাল শ্যামল মনোরম এই প্রকৃতি—সবাই আপন জন। প্রকৃতির সঙ্গে অভিন্ন। কোকিল, কেতকী মনের কথা বলে, সোনাইয়ের টলটলে জলে, চিক্‌চিক্ স্রোতে ওরা জীবনের ছন্দ খুঁজে পায়। ওরা সোনাই নদী ছাড়তে পারে না। এখানে জীবনের দীক্ষা নেয়। সোনাই ওদের সঙ্গে কথা বলে, নাচে, হাসে কাঁদে।

বাগান পার হয়েই দেড় কুড়ি হাত সমান লম্বা একটা বাঁশবাগান। দু-জায়গায় বড় বাঁশ। বাকীগুলো ছোট ছোট কাঁটা

*থেকেরা—একরকম টক ফল

বাঁশের ঝাড়। তার মাঝখানে যে সরু রাস্তাটা আছে সেটা দিয়ে সোনাই নদীর ঘাটে নামা যায়। আর পিছন দিকের উঠোন থেকে সোনাইয়ের ঘাট পর্যন্ত মাত্র দুই মিনিটের রাস্তা। জল আনতে হ'লে, যে কোনো সময়ে আর যে কোনো কাপড় পরেই সোনাইয়ের পার থেকে জল আনতে ওদের অসুবিধে হয় না। লোকের উঠোন মাড়িয়ে কিংবা বড় রাস্তা দিয়ে সোনাই-এ যেতে হয়না। নিজের বাগানের পিছন দিক দিয়েই যাওয়া যায়। হাতীচুঙের লোকগুলোর পিছন দিককার উঠোনের কুয়োটা যেমন ওদের নিজেদের, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বাসন্তীরা যে ঘাট থেকে জল তোলে, সেটাও তাদের নিজস্ব। এই ঘাটেরও একটা নাম আছে—ঠানুয়া ঘাট। ওদের একজন প্রপিতামহের নাম ছিল ঠানুয়া কলিতা। তিনি খুব ভালো জেলে ছিলেন। শোনা যায়, উনি যেরকম ভাবে বড়শীতে মাছ ধরতেন, সেরকম কেউ পারতো না, পারবেও না। এই ঘাটেই একহাত সমান কত কচ্ছপ বড়শীতে ধরে তিনি জিইয়ে রেখে দিতেন। এমনি ভাবে কত যে রুই চিতল জিইয়ে রাখতেন তিনি। এ ব্যাপারে তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। এখন ওঁর নামেই ঘাটের নামকরণ হ'য়েছে।

স্নান করতে ঘাটে গেল বাসন্তী। ওপারে যতদূর দেখা যায় চোখের দৃষ্টি ফেলল তাতে। কোনটা কি গ্রাম হ'তে পারে ভাবতে চেষ্টা করল। এইটে হ'ল খলপীয়া ঐটা চাবুকধরা। ঠিক চোখের সামনে যেটা পড়ে সেটা গাঙচিলা। ও যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে আট হাত খানেক পূবে যে ঘাটটা, সেই দিক দিয়েই তো ছেলেটা যায়। প্রায় সে সাইকেলে করেই আসে। কিন্তু কোথা থেকে আসে? গাঙচিলা, খলপীয়া, কুঁজী না কছুয়া আঁটি? ওর নাম কি? বাড়ীতে কে কে আছে? বিয়ে করেছে? কিন্তু ছেলেটি বাসন্তীকে চেনে। একদিন সে এসেছিল দাদাকে খুঁজতে। সাইকেলটা গেটের সামনে রেখে দিয়ে হন্ হন্ করে বৈঠকখানার দিকে এগুছিল। আজ ওর ঠিক মনে পড়ে গেছে। ওর গায়ের

শার্টটা বকের ডানার মত সাদা। ধুতি পরেছিল মালকোচা দিয়ে। দাদার মতই বুকের বোতামগুলো লাগায় না। জামার হাত দুটো কনুইয়ের কাছে গোটানো। দাদার মুখে এক জঙ্গল দাড়ি, ওর মুখ কিন্তু পরিষ্কারভাবে কামানো। কালো গোঁফের জন্য মুখের রঙ যেমন ফর্সা, দেখতেও তেমন সুশ্রী। ছেলেটি দেখতে বেশ লম্বা চওড়া। দশজনের মধ্যে চোখে পড়ে। আর গলার স্বরটা কি গম্ভীর! পুরুষ মানুষের গলা তো এরকমই হওয়া উচিত। ওর গলার ঐ গম্‌গমে আওয়াজে যেন গগনা* যন্ত্রের সুরে বেজে ওঠে। এরকম গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় যে এদের নিজেদের উপর বিশ্বাস খুবই বেশী। অন্য লোকেদেরও এদের বিশ্বাস করা উচিত। এরকম গলার আওয়াজ শুনলে কোন্ মেয়েরই না বুকের মধ্যে আনচান করে?

বৈঠকখানা দরজায় পা দিয়েই সে বলে উঠল—বাড়ীতে কে আছে? ভোগরামদা আছেন নাকি?

পাশের ঘর থেকে বাসন্তী উত্তর দেয়—দাদা নেই। কি দরকার?

—তাহলে শুনে যাও, একটা কথা আছে।

বাসন্তী বৈঠকখানার ঘরে এল।

বলল—ও তুমিই তাহলে বাসন্তী। তোমার দাদা সব সময়ই বাসন্তী বাসন্তী বলে ডাকতেন শুনে আমি ভেবেছিলাম, তুমি হয়তো ছোট একটা মেয়ে হবে। এখন দেখতে পাচ্ছি, তুমি বেশ ডাগর সুন্দরী মেয়ে।

—বসুন।

—না বসতে পারব না। অনেক কাজ আছে। একটা খবর দিতে এসেছি।

দাদাকে বলবে, গাঙচিলার চাকিরাম খবর পাঠিয়েছে, ওর

*আসামের একধরণের বাদ্যযন্ত্র

বাড়ীতে এক গাড়ী ধান আছে। কালকের মধ্যেই মেপে নিয়ে আসে যেন।

—আচ্ছা বলব।

লোকেটি যেমন করে এসেছিল, তেমনি হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সে যখন কথা বলছিল, বাসন্তী তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সব কিছু যেন ভুলে গিয়েছিল। ওর নামটাও জিজ্ঞাসা করা হ'লনা। ওকে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে বৌদি দেখেছে, কিন্তু বাসন্তী বৌদিকে ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করল না। বৌদিটা যা ঠোঁটকাটা উত্তর দেওয়ার আগেই বলবে, কি রে, মনে ধরেছে না কি ?

আর একবার এসেছিল সে। সেদিন সে দাদার সঙ্গে কথা বলছিল। তাদের সামনে দু গেলাস চা রেখে দিয়ে চলে গিয়েছিল বাসন্তী। কিন্তু সেদিন ওর বুকের মধ্যে কি যেন একটা কাঁটা খচ্‌খচ্ করছিল। সে কথা বলার সময় লুকিয়ে দুবার ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। একবার ওর টানা টানা সুন্দর চোখ দুটো বাসন্তীর উন্নত বুকের উপর এসে পড়েছিল। ও তখন লজ্জায় মরে যাবার জোগাড়। অসাবধানে দরজায় ধাক্কা খেয়েছিল বাসন্তী। তাতে ওর আরও লজ্জা করছিল।

সোনাই নদীর এক হাঁটু সমান জলে নেমে গিয়ে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে ও এই সব কথাই ভাবছে। শরীরের ভেজা জায়গাগুলো রোদে শুকুচ্ছে। ডুব দিয়ে স্নান করতে ভুলে যায় বাসন্তী। ভাবছে শেষবার যে দিন সে এসেছিল। মানে পরশু।

বৈঠকখানা ঘরটা ঝাঁট দিচ্ছিল বাসন্তী। এমন সময় সে এসে পড়ে। এবারে বাসন্তী সংকোচ কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়েই ওকে বসতে বলে। সে একটা মোড়ায় বসে পড়ে। বাসন্তী ঝাঁটাটা বেড়ার গায়ে রেখে নিজেই বলল, দাদা নেই, ফুলগুরি হাটে গেছে।

বাড়ীতে বৌদি নেই বলে বাসন্তীর আজ এত সাহস !

আজ দুপুরে বদো মণ্ডলের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার এলাহি

আয়োজন ! তিনটে খাসীর মাংস রান্না হবে। বৌদি এখন ওদের বাড়ীতে গেছে, কুটনো কেটে সাহায্য করতে। দেউকন আর চিকুনী খেলছে উঠোনে।

—আচ্ছা তুমি ওঁকে একটা কথা বলতে পার। উনি কাল শহরে যাবেন আমায় বলেছিলেন। এই কাগজটা নাও। এখানে কয়েকটা ওষুধের নাম লেখা আছে। এই নাও পয়সা। বলো ওষুধগুলো কিনে আনতে বলেছি। আমি পরশু নাগাদ এসে নিয়ে যাবো।

এই বলে সে কাগজখানা আর পাঁচ টাকার নোট একটা পিঁড়িতে রেখে দিল। বাসন্তী ওগুলো তুলে নেয় তারপর কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে থাকে। বাসন্তীর মনে হল এরকম ভাবে চুপ হয়ে যাওয়ায় ওর অস্বস্তি হচ্ছে আর ওরও ভালো লাগছে না। বসবার ঘরে এক ঝলক মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল, সেই হাওয়াতে বাসন্তীর ছোট একটা নিঃশ্বাস মিশেছিল ! ভারী বুদ্ধিমান, নিজে থেকেই সেই আত্মবিশ্বাসপূর্ণ সংগীত মধুর স্বরের ঝঙ্কার তুলে বলে—বাসন্তী ঘরে লোক এলে তুমি শত্রু এসেছে মনে কর, না ?

কথাটা বলে সে খুব জোরে হাসতে চেষ্টা করে।

হঠাৎ ঘরের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে পড়ে। বাসন্তীর মনটা যেন হালকা হয়ে যায়। তারও রক্তাভ অধরে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে। বাসন্তীর মনে হল এই হাসি যেন জীবনে প্রথম বারের মত প্রেম ও বাসনার রঙীন মাধুরী মিশিয়ে দিয়েছে। আগে ওর হাসি ছিল নিষ্কলুষ। শরৎকালের সোনাইয়ের জলের মত নির্মল ! কিন্তু এই হাসিটা যে কত আকুলতাপূর্ণ, কত না অর্থপূর্ণ ! কত সবুজ প্রাণের সজীবতায় ভরা !

—আপনি বসুন। আমি এক পেয়ালা চা করে নিয়ে আসি। বাসন্তী বলে।

—নাঃ দরকার নেই ! সুন্দরী। মিছিমিছি এত কষ্ট না করলেও চলবে। তার চেয়ে বরং একটু কথা বলা যাক। বাড়ী থেকে আমি ভাল করেই চা জলখাবার খেয়ে এসেছি। যতক্ষণ চা করবে

ততক্ষণ তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেই আমার ভাল লাগবে।

পুরুষের মুখ থেকে বাসন্তী নিজের রূপের প্রশংসা শুনল এই প্রথম। লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। মাথা নীচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে থাকে বাসন্তী। একটু পরে বলে—একটা পান খান।

—আচ্ছা, কিছু না খেলে যদি তোমার নেহাতই খারাপ লাগে তবে তাই দাও।

বাটায় পান এনে বাসন্তী ওর সামনে ধরে—আজকে নিয়ে তিনবার এলেন, অথচ নামটাও জানতে পারিনি!

অবাক হয়ে বলে—তুমি অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করনি? আমার প্রতি তোমার কৌতুহল নিশ্চয় কম?

বাসন্তী নিজের সাফাই গায়—যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করা যায় না কি?

সে হেসে ওঠে—ওঃ বুঝেছি, কৌতুহল বেশী বলেই এত সঙ্কোচ।

বাসন্তীও হাসে। সেই হাসির কাছে উপচে পড়া সোনাই নদীর কলতানও স্তব্ধ হ'ল।

—ধর, আমার নাম গেন্ধেলা!

—ইস্, এরকম লোকের নাম গেন্ধেলা হ'তে পারে না কি?

—তাহলে, ধর রাজকুমার!

—সত্যি সত্যি জিজ্ঞাসা করছি, এভাবে মিথ্যে নামগুলো বলে কি মজা পাচ্ছেন?

—মজা করার কি আছে? ধর আমার নাম অর্জ্জুন। লক্ষ্য যার স্থির।

—বেশ মজা করার কায়দা পেয়েছেন তো?

এইবার সে আরও মুখর হয়ে ওঠে। যাত্রার গানের সুরের মত বলে 'অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়'। কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়। এই আটটা নামের মধ্যে নাম বেছে বের কর। তোমাকে তাহলে একটা ধাঁধাঁ জিজ্ঞেস করছি।

এই কথা বলেই সে রাস্তার সামনে এল। উঠোন থেকে বাসন্তী চেঁচিয়ে বলে—আচ্ছা বিজয় না ধনঞ্জয় ?

সে উত্তর দেয়—আমার নাম যে সব্যসাচী হবে না, তার কি মানে আছে ? বাসন্তীর দিকে একটু এগিয়ে এসে ও বলে—এই তিনটে নামের মধ্যে কোনটা পছন্দ হয়েছে ?

—পছন্দ হওয়া না হওয়ার কথা নয়। যে নামে আপনি পরিচিত, সেই নামটা জানতে চাই। সব্যসাচী নামটা আগে কখনও শুনিনি।

—যে লোক আমাকে চিনবে, সে নাম না জানলেও চিনবে। তুমি এর যে কোন একটা নাম ইচ্ছে মত ভেবে নাও। ধর আমার নাম ধনঞ্জয়।

—হ'তে পারে না।

—তাহলে বিজয়।

—তা অবশ্য হ'তে পারে।

—দূর, তাহলে আর নাম জিজ্ঞাসা করব না, এখন যে নামটাই বলবেন, তাতেই সন্দেহ হবে।

স্নান করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বাসন্তী এইসব কথা ভাবছিল। সে পরশুদিন আসবে বলেছিল আর আজকেই তো সেই দিনটা।

চুপি চুপি বাসন্তী বৌদির শোবার ঘরে ঢুকে সাবধানে সারা ঘরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কোথাও কিছু পেল না। অবশেষে বিছানার নীচে একটা পোঁটলা দেখতে পেয়ে সেটা খুলে দেখে কতকগুলো ওষুধের শিশি। শিশিগুলো এক সাইজের। এরকম শিশিতো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারাই কেনে। কোন শিশিতে লেখা আছে পালসেটিলা—৩০, কোনটাতে নাক্সভমিকা আর সঙ্গে একটা নম্বর। ও আগের মত করেই পোঁটলাটা বেঁধে রাখে।

বাসন্তীর কৌতূহল কিছুটা মিটল। ও বুঝতে পারল ছেলেটি ওর দাদার হাতে শহর থেকে এই ওধুধগুলোই আনিয়েছে। এই ছেলেটি অর্থাৎ বাসন্তীকে আকর্ষণ করা প্রথম পুরুষটি তাহলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই করে।

আচ্ছা, সে যদি ডাক্তার হয় তো, ওর হাতে ডাক্তারী ব্যাগ ছিল না কেন ? সাইকেলে যে খাঁকী রঙের ব্যাগটা আছে, তাতে হয়তো ডাক্তারী ব্যাগটা ঢুকিয়ে রাখে।

অজান্তে ওর মনটা খুশীতে ভরে ওঠে। সোনাই থেকে বয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাসের ছেঁায়াতেও ওর শীত লাগছে না। কি একটা উত্তেজনায় ওর রক্তের স্রোত দ্রুত বইতে থাকে। এই শীতেও ওর শরীরে ঘাম দিয়েছে। দুপুরবেলা ও ভাল করে, ভাতও খেতে পারল না। কয়েক গ্রাস খেয়েই উঠে পড়ে। আধঘণ্টা বাদেই ওর ক্ষিদে পেল। তখনই ওর মনে পড়ে যায় যে, অকারণে ভাত খাওয়া শেষ হল বলে উঠে পড়ার দরুণই ওর ক্ষিধে পেয়েছে এখন।

প্রায় বিকেল হ'তে চলল। একটু পরেই তাহলে সে আসবে। আজ যখন আসবে বলেছে তখন সে আসবেই। পুরুষ মানুষের এক কথা। তাছাড়া, এমন করে যারা চিকিৎসা করে বেড়ায় তাদের মুখের কথার মূল্য তো আরও বেশী। বেলা পড়তে আরও ঘণ্টা দুয়েক আছে। ঘরের সামনের সুপুরী গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'ল।

ওর আজ ভাল কাপড় পরে সাজতে ইচ্ছে করল। কিন্তু পরল না, পরলেই অন্য লোকের চোখে পড়বে। তখন সবাই জিজ্ঞেস করবে, ও কোথাও আজ বেরুবে নাকি ? নাঃ ও কোথায়ও বেরুবে না। ও বেরুলে সেই সময়ই হয়তো সে এসে পড়বে। আটপৌরে কাপড়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালটা বেছে ও পরে নিল। জরীর কাজ করা জবা ফুল রঙের ব্লাউজটা পরতে ওর খুব ইচ্ছে হ'ল আজ। মুখে লাগাল একটু স্নো, তার উপর পাউডারের প্রলেপ। আয়নায় মুখ দেখল। বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখশ্রীর কমনীয়তায় নিজেই বিস্মিত হ'ল। আয়নার সামনে নিজেকে নানাভাবে দেখে একটা পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল।

বৌদি চিরুণী চাইতে ওর ঘরে ঢুকেছিল। ওকে এত ভালভাবে সাজতে দেখে জিজ্ঞাসা করে—কোথাও যাবি নাকি ?

বাসন্তী একটুও অপ্রস্তুত হল না। উত্তর দিল,—যাব

না। এমনি মুখখানা শুক্‌নো শুক্‌নো লাগছে বলে স্নো মাখলাম একটু।

—যাবি তো বল্, আমিও যাবো। কদিন ধরে রঞ্জিতা যেতে বলছে ওর বাড়ীতে।

—না যাবো না। শরীরটা ভাল লাগছে না।

—হ্যাঁ, পাতে যখন ভাত ফেলে রেখেছিলি, তখনই বুঝতে পেরেছি। পেটের গোলমাল না কি?

—না এমনি ক্ষিধে হচ্ছে না। হ্যাঁ গো বৌদি, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। বিছানার নীচে যে পোঁটলাটা আছে, তাতে কি রেখেছ?

—ওটা আমাদের জিনিষ নয়। ধনঞ্জয় তোর দাদাকে শহর থেকে আনতে বলেছিল। পোটলার মধ্যে ওষুধ আছে।

—হ্যাঁ, বুঝেচি। কিন্তু এই ধনঞ্জয় বলে লোকটার বাড়ী কোথায়?

—গাঙচিলায়।

কথা প্রসঙ্গে ও অনেক কথাই বের করে নিল। ওর নাম তাহলে ধনঞ্জয় আরও যা ভেবেছিল ঠিক সেই জায়গাতেই ওর বাড়ী। সে অনেকগুলো নাম বলে শুধু শুধুই ওকে ধাপ্পা দিয়েছিল।

এমন সময় ওর দাদা ঘরে ঢুকে ওদের জন্য দু গেলাস চা পাঠিয়ে দিতে বলে। কথাটা শুনে বাসন্তীর মনে হ'ল যে ধনঞ্জয় এসেছে। দরজার ফাঁক দিয়ে ও ধনঞ্জয়কে দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল। বৌদির আদেশে আগুন জ্বালায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না জল গরম হয়, ততক্ষণ ওদের কথা শুনলে কেমন হয়? ধনঞ্জয় ওর দাদার সঙ্গে কি কথাবার্তা বলে। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল।

ধনঞ্জয়ের কথা কানে এল ওর। সে বলছে, এর মূলে হচ্ছে ধার দেওয়া সুদখোরদের প্রবঞ্চনা। চাষীরা চাষ করলে হবে কি? লাভটা তো ওরাই নেবে, চাষীরা ন্যায্য মূল্যে জিনিস বিক্রি করতে পারে না।

ভোগরামের কথাটা ওর কানে গেল—তবে লোকগুলো যেরকম,

ওরা আবার মহাজনদেরই উপকারী মনে করে। এদিকে যে ছারপোকার মত ওরা রক্ত চুষে খাচ্ছে, তা বুঝতে পারে না।

ধনঞ্জয় উত্তর দেয়—সেইজন্য তো ভাবছি এবারে গাঙচিলাতে একটা সমবায় সমিতি সংগঠন করতে হবে। কারণ তখন যদি জনসাধারণ······

এমন সময় বৌদি বাসন্তীকে ডাকে। ও রান্নাঘরে এল। বলে, জল ফুটে গেছে। তুই বাইরে চা দু কাপ দিয়ে আয়। আমার কাপড়টা বড় ময়লা।

চা দেওয়ার সময় বাসন্তী ধনঞ্জয়ের দিকে তাকাতে পারে না। দাদার সামনে ওর দিকে তাকাতে বাসন্তীর সঙ্কোচ হল। সেও ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তবুও সারাদিন ধরে এই প্রতীক্ষা ও সাজগোজ যে ব্যর্থ হয়ে গেছে, একথা মনে হয়নি বাসন্তীর।

দুই

বাসন্তীর মায়ের বেশ বয়েস হয়েছে, যাকে বলে থুরথুরে বুড়ী। সুজলার শরীর একদিকে হেলে গেছে, মাথার চুল সব পাকা। কফ বা বাত—বারো মাসই একটা না একটা অসুখ লেগেই আছে। তাঁকে বয়স জিজ্ঞাসা করলে, গুণে বয়স বলতে পারেন না। শুধু বলেন, প্রথম যে বড় ভূমিকম্পটা হয়েছিল তার কথা মনে আছে। তার থেকেই অনুমান করা যায় যে তাঁর বয়স তিন কুড়ি পাঁচ বছরের উপর। সুজলার অসুখ-বিসুখ হলেই ছেলে চিকিৎসা করায়। কিন্তু ওষুধ-বিষুদে খরচ হতে দেখলেই বলবেন—কেন আর মরা হাঁসকে যত্ন করে শুইয়ে রেখেছ? দাঁত নেই, নখ নেই, চামড়া কুঁচকে গেছে, যমের বাড়ীতে যেতে আর ক'দিন বাকী? অবশ্যি ছেলে বৌ বুড়ীর কথায় কান দেয় না। একটু কিছু অসুখ হলেই তাড়াতাড়ি ওষুধের

ব্যবস্থা করে। তিনিও বাড়ীর সবার কাছেই কৃতজ্ঞ। বয়স হয়েছে দু'এক বছরের মধ্যে মরতেই হবে। উনি না থাকলেও সংসার চলে যাবে, কারণ এরা এখন বড় হয়েছে সমঝদারও হয়েছে। সেজন্য একটু আধটু অসুখ হলে বুড়ী তো কাউকে কিছু বলেনও না ও জানায়ও না। কিন্তু না বললে কি হবে, বাসন্তী আর ওর বৌদি তরুলতা মাকে খুব ভালবাসে। একটু কিছু অসুখ হলেই বুঝতে পেরে ব্যস্ত হয়। আজ প্রায় মাসখানেক হয়েছে অগ্রহায়ণ পড়তেই সুজলা হাঁটতে প্রায়ই হোঁচট খায়। একদিন লাঠিতে ভর দিয়ে কনপাইর বাড়ী যাচ্ছিলেন পান আনতে। কিন্তু কনপাইর বাড়ী আর যাওয়া হ'ল না। ভুল করে মণিপুরীয়াদের বাড়ীর কাছে আবর্জনার স্তূপটার কাছে এসে দাঁড়াতে, মণিপুরীয়াদের বাড়ীর শিঙওয়ালা বলদটা তেড়ে এল বুড়ীর দিকে। ওর শিঙ যা ধারালো, একমাত্র ওকে নিয়ে যে লাঙল দেয় তাকে ছাড়া ও কাউকে পরোয়া করে না। যাকে তাকে গুঁতিয়ে দেয়। বলদটা ঐ আবর্জনার স্তূপটার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাউয়ের ডগা খাচ্ছিল। সুজলাকে কাছে আসতে দেখে ফোঁস করে তেড়ে গুঁতিয়ে ফেলে দেয়। মণিপুরীয়ার ছেলে ওকে না দেখলে সেদিন বলদটা হয়তো মেরেই ফেলত তাঁকে।

সেদিন থেকেই সুজলাকে ছেলে বৌ-য়েরা বাড়ী থেকে বেরুতে মানা করত। তবুও সুজলা আর এক বিপদ বাধালেন। নারকেল ঝোপের নীচে গা ধোয়ার জন্য প্রায়ই এক বালতি জল রাখা হয়। তিনি হাতড়ে-হাতড়ে জলের বালতিটাকে খুঁজে নেন। কখনও কখনও আবার জল তোলার জন্য ঘটী বা গেলাসটা না পেয়ে এক আঁজলা করে জল ছিটিয়ে স্নান সারেন।

দিন দুয়েক আগে একটা অঘটন ঘটে গেল। বাড়ীর পিছন দিকটায় বুড়ীমা বেড়াতে যান। আধ ঘণ্টার উপর হয়ে গেল ফিরে আসেননি। তরুলতা ও বাসন্তী ভীষণ চিন্তিত হয়। ঘরের চারিদিক খুঁজে না পেয়ে ওরা পিছন দিকের সব্জীবাগানে গিয়ে দেখে, উঁচু ঢিপিটার কাছে হাত চারেক গভীর একটা খালের মাধ্য বুড়ীমা পড়ে আছেন।

সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, বুড়ীমা চোখে কিছু দেখতে পান না। অবশ্য এ কথা ভোগরাম জানে না। ব্যবসার ধান্দায় চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সে। পাখীরা যেটুকু সময় বাসায় থাকে, ভোগরামও ততটুকু সময়ই বাড়ীতে থাকে। বাসন্তীর রাগ হ'ল মায়ের উপর। চোখে দেখতে পাননা একথা আগে বলেননি কেন? রাজরোগেরও যখন চিকিৎসা আছে তখন চোখে দেখতে না পাওয়ারও কি কোন প্রতিকার নেই? মা যদি কোথাও পড়ে মারা যেতেন, তাহলে তো ওদেরই দোষ হ'ত।

বাসন্তী কিন্তু মায়ের উপর মোটেই রাগ দেখাল না। শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল—মা, তোমার চোখে ব্যথা করে না খচ্‌খচ্‌ করে? চোখে কি কিছু দেখতে পাওনা?

—হ্যাঁ, কিছুদিন হ'ল আমি চোখে মোটে দেখতে পাচ্ছি না। বয়স হল তো, তাই চোখে ছানি পড়েছে। এ কিছু নতুন কথা নয়। দাঁত চোখ সবই গেল, এখন ওপারের দিকে পা বাড়িয়ে আছি। তবে জন্ম মৃত্যু বিধির লিখন। ডাক্তার কবিরাজও তো আমাদের মত দু' হাত-পাওয়ালা মানুষ ছাড়া, আর কিছু?

মায়ের কথায় বাসন্তী দুঃখ পেল। এই তো জীবন! তবুও মানুষের কত অহঙ্কার কত অহমিকা! ও মায়ের মুখের দিকে তাকায়। মায়ের ব্যথা ভরা মুখখানায় যেন সারা জীবনের ইতিহাস প্রতিফলিত। ওর মা হয়তো আর বড় জোর পাঁচ বছর বাঁচবেন। কিন্তু এই পাঁচ বছরই কি করে পৃথিবীর আলো না দেখে, সোনাই-পারের প্রকৃতির সৌন্দর্য পান না করে কি সান্ত্বনায় কোন ভরসায় কি আবেগ নিয়ে বেঁচে থাকবেন? মা তো টের পাবেন না যে সোনাইর বুকে রোদের ঝিলমিলি কত সুন্দর। অথচ এই মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েই পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে বাসন্তী। তাই ভাবে, মার চোখ ভাল না হলে বেঁচে থেকে লাভ কি? আজ তিন দিন দাদা বাড়ীতে আসেনি—গিয়েছে দরণ্ডিয়াল গ্রামে। সেখানে নাকি বড় একটা মেলা বসেছে। অনেক লোকের সমাগম। দোকান-বাজারও বসেছে।

সেখানে ভোগরাম গেঞ্জি, কামিজ, ব্লাউজ, সেমিজ, কম্বল ইত্যাদি বিক্রী করছে। বাসন্তী তার অভিমত জানায় বৌদিকে। বৌদি সম্মতি দেয়।

দুপুরে বাসন্তী মাকে ভিজে গামছা দিয়ে গা মুছিয়ে দিতে দিতে বলে,—মা, আমি ভাবছি, দাদা এলে বলব তোমাকে একদিন শহরে নিয়ে যেতে। সেখানে ডাক্তার চোখের ছানি কেটে দিলে আবার আগের মত দেখতে পাবে।

মুহূর্তের জন্য মায়ের মনে আনন্দের দোলা লাগে। বলেন—তাই নাকি ? তুই কি করে জানলি ?

গেল ভাদ্র মাসে মাসীর বাড়ীতে গিয়ে আমি জানতে পেরেছি, মা। সেখানে যোগেন মোড়ল থাকে। তার মায়েরও এরকম ছানি পড়েছিল চোখে। অবশ্য ছানি কাটানোর পরে চোখে চশমা পরতে হয়।

বাসন্তী লক্ষ্য করে মা ওর কথা মন দিয়ে শুনছেন না। মা বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। উপরের দিকে মাথা তুলে কি এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিছুক্ষণ বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—চোখে দেখতে পেলে অবশ্যি ভালো। কিন্তু আমার দোহাই বাসন্তী, তুই ঘুর্ণাক্ষরেও কথাটা যেন দাদার সামনে তুলিস না। সে খুব দুঃখ পাবে। দেখতেই পাচ্ছিস, এই মাসটা সে কত খাটছে। ঘুরে ঘুরে তার গায়ের রঙ তামাটে হয়ে গেছে। এখন যদি বলিস মুশকিলে পড়বে।

—কিন্তু, আমিই বা না বলে কেমন করে থাকি ?

—দেখ, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, এখন তোমাদের দিকে তাকিয়েই বেঁচে আছি। আমার জন্য এখন যদি তোদের দুঃখ কষ্ট বাড়ে, তাহলে কোন ভরসায় আমি বেঁচে থাকবো ! তরুকেও বলছি আমি, ভোগরামকে এই দুটো মাস আমার চোখের অসুখের কথা যেন কিছু বলে না। তুই যদি বলিস আমি খুব দুঃখ পাব।

—দাদা প্রায়ই শহরে যায়। একটি গাড়ী করে তোমায় নিয়ে যেতে কোন অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু সেখানে গেলেই কি সব সমস্যা মিটবে? কত খরচ পড়বে? সবসময়ই তো দেখছিস্, এতগুলো লোক পুষতেই তো ও কাহিল, তার উপর আবার আমার চোখের চিকিৎসা।

কিছুদিন পর্যন্ত কথাটা দাদাকে বলবে না বলে মাকে কথা দিলেও ওর মনটা ভারী হয়েই রইল। মায়ের একটা ব্যাপারে ও অবাক হল। তাঁর বয়স হয়েছে, চোখে দেখেন না, সর্বদা দুঃখকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। তার জন্য শারীরিক যন্ত্রণা হ'লেও মনে কোন কষ্ট নেই। বার্ধক্যের জন্যও অনুশোচনা নেই। স্বামী বিয়োগের যন্ত্রণাও নীরবে সহ্য করেছেন। সেজন্যেই বাসন্তীর যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ওর মনটা কেবলই ওর মায়ের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। ওর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমিত; জীবনের সামনে কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন। কৌতূহল বেড়ে যায়।

রাত্রে শোবার সময় ঐ ধরণের কোন একটা ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন করায় মা খুব তাড়াতাড়ি ওর মনের কথা বুঝে নেয় দেখে ওর আশ্চর্য লাগে। মা ওকে বলেন যে, এখনকার এই অবস্থার জন্য তিনি একটুও বিচলিত নন। জীবনে তিনি অনেক কিছুই পেয়েছেন—পেয়েছেন পূর্ণতা। অনুশোচনা করার কারণ নেই। যাদের ফেলে আসা দিনগুলো কিছু দিতে পারে না, তারাই শুধু অতীতের হারানো দিনের কথা ভেবে ব্যর্থ জীবনের প্রতি মুহূর্তকে বিষিয়ে তোলে।

কথাটা মা খুব সহজভাবেই বলেছিলেন। ওঁর এই জীবনবোধে যে কোনরকম কৃত্রিমতা ছিল না বাসন্তী খুব ভাল করেই উপলব্ধি করেছিল। তিনি বেঁচে থাকার পাথেয় খুঁজে পেয়েছেন।

ছন্দময় গতিশীল জীবনে অনেক ঘটনাই তোলপাড় করে। জীবনে নতুন রঙ লাগে। কিন্তু সময়ে সব ভুলে যায়। সময় যৌবন ও বাসনাকে ক্ষমা করে না। সাত পুরুষের এই সোনাই নদী প্রতিদিন বাসন্তীকে কেবল এই কথাই বলে। সোনাইয়ের কুলু কুল কলতানে অনেক কথাই ভেসে ওঠে আর বাসন্তীর কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যায়—ওর মন যায় জুড়িয়ে। বাসন্তী যেন অবর্ণনীয় ভাষা বুঝতে পারে।

বুঝতে পারে প্রেমের কথা, জীবনের কথা এবং নশ্বরতার কথা। এই সোনাইর বুকেই কত প্রেম অঙ্কুরিত হল, কত প্রেম এর ঢেউয়ের সঙ্গে হারিয়ে গেল,—অদূর ভবিষ্যতেও কত প্রেম কত নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সোনাই-এর আকাশে বাতাসে। সোনাই-এর শান্ত শ্যামল প্রকৃতির মাঝে নতুন রূপে ধনঞ্জয়কে সে দেখতে পেল। ওর নতুন চেতনার উন্মেষ হ'ল। ও বুঝতে পারল, যৌবনের পরিপূর্ণতায় কারুর মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া বা কারুর মুঠোর মধ্যে নিজেকে ধরা দেওয়ায় কত অনাবিল আনন্দ। ধনঞ্জয় কি আর ওর বাড়ীতে আসবে না? এই দশ দিন কি ও গাঙচিলায় নেই? ও যদিও বা আসে, তবে নিভৃতে দেখা করার সুবিধে পাবে কি? ওপার থেকে বিরিণা* বনের মাঝে এক রাখাল বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে। বাঁশীর ব্যাকুল সুরে ঠাকুয়া ঘাটটা মুখরিত হয়ে ওঠে। কলসীতে জল ভরার সময় ওর মনে বিদ্যুৎ খেলে যায়। অকারণেই ও ভাবে—হঠাৎ ধনঞ্জয় এসে এখানে হাজির হবে আর খুব মিষ্টি করে কথা বলবে।

কিন্তু মায়ের চোখ দুটো যদি এতদিনে ভালো হয়ে যেত? মায়ের আদেশ অমান্য না করার জন্য এতদিন ও ভোগরামকে কিছু বলতে পারে নি—বলার সুযোগও পায় নি। আজকাল বাড়ীতেই থাকে না ভোগরাম। সোমবার সকালেই সাইকেলে চড়ে জেলায় যায়। রাত্রে বাড়ী ফেরে সাইকেলের 'কেরিয়ারে' এক মোট বোঝা নিয়ে। শহর থেকে কিনে আনা জিনিষের এই বোঝাটা ও কাউকে ছুঁতে দেয় না। এখানে ওর ব্যবসায়ের জিনিষপত্র থাকে। যেমন— কামিজ, কমদামী ধুতি, এক বাণ্ডিল সুতো, ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক-জামা, আর মার্কিন কাপড়ের থান নয়তো সস্তার দু-চারখানা কম্বল। মঙ্গলবার সকালে এই জিনিষগুলো সাইকেলে করে জাজরির হাটে নিয়ে যায় আর বেলা পড়লে বাড়ী পৌছায়। বুধবার আবার একই কাজের জন্য ঝরঝরে সাইকেলখানা শহরে নিয়ে যায় আর

*বিরিণা এক প্রকারের বন্য গাছ।

একই সময়ে ঘরে এসে পৌঁছায়। বৃহস্পতিবারে আগের দিনের কেনা জিনিষগুলো দলংঘাটের বাজারে বিক্রী করে আসে। রোদ্দুর ভাল করে উঠে যাবার পর ক্লান্ত হয়ে ফেরে। শুক্রবারে যায় জেলায়। শনিবার তার ব্যবসায়ের জিনিষপত্র ফুলগুরি হাটে বেচতে যায়। ফুলগুরির হাটটা বড়। সারাদিন ধরে হাট বসে। সেজন্য শনিবারে বাড়ী ফিরতে তার সন্ধ্যে হয়ে যায়। তার যে কত ঝঞ্ঝাট। ও বলেই এত কষ্ট সহ্য করতে পারে। আর তাছাড়া কষ্ট না করলে তো উপায়ও নেই—এতগুলি পুষ্যি। তাদের ভরণপোষণ তো করতেই হবে। চাষের জমি মাত্র তিন একর—এক কড়াই ঝোলে একটা লঙ্কা। এরকম টুকিটাকি ব্যবসা না করলে সংসার চলবে কি করে? ওর খাওয়া শোওয়ার ঠিক নেই। সকালে ক্ষিধে না পেলেও ভাত খেতে হয় আর যখন ক্ষিধে পায় তখন খেতে হয় বাইরে। অনিয়ম করার জন্য আজকাল ওর পিত্তি পড়ছে। পকেটে সবসময় একটা সোডার পুরিয়া নিয়ে ঘোরে। দাদার দুঃখ দেখে বাসন্তীর বড় মায়া হয়। ওদের মানুষ করতে দাদার কি আপ্রাণ চেষ্টা। মা ঠিকই বলেছেন,—এই কয়েকটা মাস তার খুব কষ্টের দিন। আমার কথা বললে শুধু কষ্ট বাড়বেই। এত খেটেও পয়সা-কড়ির সুবিধে করতে পারছে না—অভাব তাড়াতে পারছে না। লাভের টাকায় জোড়া-তালি দিয়ে সংসারটাকে কোনরকমে চালাচ্ছে।

তবুও মায়ের অসুখের কথাটা বলবে বলেই বাসন্তী একদিন সুযোগ খুঁজছে। সে এত ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরে যে, ওকে বলতে কিরকম যেন লাগে বাসন্তীর। মাঝে মাঝে আবার মুখ গোমড়া করে বাড়ীতে ঢোকে। বোধহয় ব্যবসায়ে লোকসান হয় সেদিন। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ছোট একটা নোটবইতে খুব মনোযোগ দিয়ে কি যেন লেখে—বোধহয় দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ। সেই সময়ে ওকে কিছু বলতেও ভয় করে।

কিন্তু ভোগরামেরও নজর কম নয়। বাড়ীতে কম সময় থাকলেও সে মাকে ঠিকই লক্ষ্য করে। মা যে একদিন খালে পড়ে গিয়েছিলেন,

সেকথা সে জানে না। কিন্তু মায়ের চোখ যে আগের মত নেই এই কথা সে তার তীক্ষ্ণ ব্যবসাদারী দৃষ্টিতে ধরতে পেরেছে। বাসন্তী ও তরুলতা এতদিন ওর কাছে কথাটা চেপে গেলেও ও আজ টের পেয়ে যায়।

ভাত খাবার সময় সে তরু আর বাসন্তীকে রাগ করেই বলে,—আমি জানি, মা আমাকে বলবে না। চিকিৎসা করতে গেলেও আমার কষ্ট হবে বলে মনে করেন। তা বলে তোমরা আমাকে কিসের জন্য জানাও নি ?

তরুলতা নীরব। বাসন্তী ওদের দোষ স্বীকার করে। ভোগরাম বলে যে, দুদিন পরেই সে গরুর গাড়ীতে করে মাকে শহরে নিয়ে যাবে। এখন পাট ব্যবসার সময় নয় বলে ওর নিজের গাড়ীর চাকা খুলে রেখেছে। গাড়ীর মাচাটাও খারাপ হয়ে গেছে। সে সদরের বাড়ীর গাড়ী আর গাড়োয়ানের ব্যবস্থা করেছে। হাসপাতাল আর ডাক্তার সম্পর্কে কিছু বিশেষ জানে না বলে ধনঞ্জয়কেও নিয়ে যাবে সঙ্গে। সেও যাবে বলে কথা দিয়েছে।

* * *

গোরুর গাড়ীর মাচায় খড় দিয়ে ছাওয়া হল। গাড়ীতে পাটি পেতে একটা বালিশ দেওয়া হ'ল। মা গাড়ীতে উঠল। সুজলা প্রথমে যাবেন না বলেই বাহানা করছিলেন। অনেক করে বলাতে তবে শহরে যেতে রাজী হন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করলেও সুবিধে আছে কারণ জেলার অনেক লোকের সঙ্গে ওর পরিচয়। অনেক ডাক্তারের সঙ্গেও পরিচিত। সে সরকারী হাসপাতালে বুড়ীমাকে দেখায়। সেইদিন তাঁর চোখের ছানি কাটানো হ'ল। কিন্তু সেদিন বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য ডাক্তারের কাছে অনুমতি পাওয়া গেল না। কাজেই গরুর গাড়ী করে ভোগরাম বাড়ী ফিরে আসে। সে শহরে চারদিন থাকলে ওর অনেক লোকসান। বৃহস্পতি ও শনিবারে যদি হাট করতে না পারে তাহলে সপ্তাহের সংসারের খরচ চালানোই মুশকিল হবে। ভোগরামের অনুরোধে ধনঞ্জয় মায়ের কাছে থেকে গেল।

চোখের ছানি কাটানের পর মায়ের চোখ তিন দিন বেঁধে রাখা হল। চার দিনের মাথায় বাড়ী নিয়ে আসার অনুমতি পাওয়া গেল।

বাসন্তীর অন্তরে যেন কিসের ঢেউ খেলে যায়। ধনঞ্জয় খুবই ব্যস্ত লোক। তবুও সে ওর মায়ের সঙ্গে শহরে চারদিন থাকলো। এর কারণ কি শুধু এই যে ধনঞ্জয় পরের উপকার করতেই ভালবাসে? এতই যদি নিঃস্বার্থ হবে তবে তো সে মানুষ নয়, দেবতা। কিন্তু বাসন্তীর মন মানল না। আসল কারণ হয়ত এই যে, এই সুযোগে ধনঞ্জয় ওর দাদা ও মাকে আপনার করে তুলে ওর সঙ্গে তার মিলনের পথ সহজ করে তুলেছে। একথা মনে হতেই নানা চিন্তা তুলোর মত ভেসে বেড়াতে লাগলো। মনের মধ্যে একটা অজানা পুলক, একটা শিহরণ অনুভব করলো।

বাড়ী ফিরে বাসন্তীর মা হুদিন চুপচাপ শুয়ে রইলেন। কয়েকদিন পরেই চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়। তিনি চোখে দেখতে শুরু করেন। ভোগরাম ও ধনঞ্জয় বুড়ীমাকে দৃষ্টিদান করে।

ওঁকে শহরে নিয়ে যাওয়ার দিন ধনঞ্জয় বড়ই ব্যস্ত ছিল। বাসন্তী ধনঞ্জয়কে চা দেওয়ার সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে দিয়েছিল। ও তার চেয়েও অর্থপূর্ণ একটা হাসি দিয়ে ওকে সম্ভাষণ জানিয়েছিল। বাসন্তী তার নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন। ধনঞ্জয়ের চরিত্রের যত বৈশিষ্ট্যই থাকুক, আজ ও নিজের রূপের দিকে তাকিয়ে একটা কথাই ভাবল। বুড়ীকে নিয়ে ধনঞ্জয়ের এত ব্যস্ত হয়ে ওঠার অর্থটা কি? কেবল বুড়ীর অসহায় অবস্থার জন্যেই কি এই মমত্ববোধ, এই উদারতা? সবার চেয়ে হয়তো আসল কারণ হল যে বুড়ী বাসন্তীর মা।

জেলা থেকে যেদিন সুজলা বাড়ী ফেরেন সেদিন ধনঞ্জয় এসেছিল। ওঁকে নিয়ে কি কি অসুবিধায় পড়েছিল ভোগরামকে সব বলেছিল। বাসন্তীও ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়েছিল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ওর কথা শুনছিল। ওর কথা বলার ধরণটা খুব সুন্দর। ভালভাবে কথা বলতে পারে এবং গলার স্বরটাও পুরুষোচিত বলেও হয়ত এত

সুন্দর লাগে, জেলায় ওর যে বেশ প্রতিপত্তি, কথা শুনেই বাসন্তী বুঝতে পারে।

সেদিন ওঁরা বাড়ী এসে পৌঁছেছিল সন্ধ্যেবেলা। ওরা জোর করল ধনঞ্জয় যেন আজ রাতটা এখানেই থাকে, রাতের খাওয়াটা এখানেই সারে। বাসন্তী বৈঠকখানা ঘরে ওর বিছানা ঠিক্‌ঠাক্‌ করে পেতে দিল।

সেদিনই ধনঞ্জয় ওকে সোজা ডেকে নিয়ে কথা বলে—বাসন্তী, আজ নিয়ে পাঁচ দিন তোমাদের বাড়ীতে আসছি। তুমি আমাকে কিছু বলে ডাকই না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে শুধু তার উত্তরটা দাও। আমি কি মুসলমানের ঘরে ঠাকুর না কি?

বাসন্তী কোন উত্তর দেয় না। শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। হাসলে ওর দু-গালে ছুটো টোল পড়ে। ওকে বেশী ভাল দেখায়। যুবতী মেয়ের সহজাত বুদ্ধি নিয়ে ও ধরতে পারে যে এটা অভিযোগ নয়—কথা প্রসঙ্গে কথা বাড়াবার একটা সুযোগ। সে হয়তো চেয়েছিল বাসন্তী ওর মনের কথা বলে, ওর প্রতি বাসন্তী আসক্ত হয়। যুবতী মেয়ের কাছে পুরুষ মাত্রই ভেড়া। তখন পুরুষের কঠিন মন কোমল হয়ে যায়।

বাসন্তী উত্তর না দিলেও ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে দমন করতে পারেনি। ও বলেছিল—আপনি লোকের জন্য এত কেন করেন? আপনি এত ভাল। সে খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে নেয়, তারপরে একটু চিন্তিত হয়ে বলে, বুঝেছ বাসন্তী, নিজের ভালর জন্যই সবসময় লোকে করে না। নিজের স্বার্থ গোপন রেখে এখনকার লোকেরা পরের উপকার করতে শিখেছে।

ভিতর থেকে দাদার গলা শোনা যায়, বাসন্তীকে ডাকছে। ও ছুটে যায় দাদার কাছে। দাদা বলে—আমার ঘরের আলনায় ধুতি আছে, দাদাকে দিয়ে এসো। বাসন্তী ধুতিখানা ধনঞ্জয়ের কাছে দিয়ে আসার সময় সে আস্তে করে বলে—বাসন্তী, সারাদিনে অবসর মুহূর্তে তুমি কিছু ভাব না? বাসন্তী নিরুত্তর। ও হাত দুখানা দিয়ে

মুখ ঢেকে ফেলেছিল। অনেকক্ষণ ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাসন্তী। সে ওর গলায় মধু ঢেলে দিয়ে বলে—তুমি খুব ভাল মেয়ে। তাই আমার এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিতে পার নি। এই কথা আমি জানি। অন্য আরেকভাবে উত্তর পেলাম।

এই কথা শোনার পর বাসন্তী আর ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে নি। কিছু না বলেই রান্নাঘরের দিকে এগোয়। ওর বুকটা টিপটিপ করছিল।······

এইভাবে আস্তে আস্তে ধনঞ্জয়ের কাছে ওর সঙ্কোচ কেটে যায়। কারণ বাড়ীর সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মা বলেন,—কোন জন্মে নিশ্চয়ই ও আমার ছেলে ছিল। আগে মনে করতাম, আমার একটা ছেলে কিন্তু ধনঞ্জয়ও আমার ছেলে। দাদা বলে—ধনঞ্জয়ের মত ছেলে হয় না। ওর মত আমিও যদি উদার হতে পারতাম! এরকম লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া ভাগ্যের কথা।

এইসব কথা শুনে বাসন্তী খুশীতে ভরে ওঠে। ধনঞ্জয়কে খুবই আপনজন মনে হয়। যৌবনে পা দেবার পাঁচ বছর পরে হঠাৎ নিজের মন ও আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন দেখে, আশা-নিরাশায় প্রায় চমকে ওঠে বাসন্তী।

তিন

গাঙচিলার লোকেরা ধনঞ্জয়কে ভালবাসে। ধনঞ্জয় কি ধরণের লোক সে কথা সবাই জানে। সে যে কোথাকার ছেলে এবং কোথা থেকে এসে এখানে ডেরা বেঁধেছে—এসব কথা কেউ জানে না। তবুও গাঙচিলার লোকেরা ধনঞ্জয়কে নিজের গ্রামের একজন বলেই গ্রহণ করে নিয়েছে।

পঞ্চাশের প্রচণ্ড প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের সময় সে কোথা থেকে

এসে হাজির হয় এখানে। ওর অনেক গুণ। লোকের সঙ্গে খুব মিষ্টি করে কথা বলতে জানে। বিপদে পড়লে ওদের সৎ উপদেশ দেয়। সে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও। লোকের বিশ্বাস, অনেক আসল ডাক্তারের চেয়েও ধনঞ্জয় ভালো। রোগীর মুখ দেখেই অসুখ বুঝতে পারে। সে আসার পর থেকেই গ্রামটির বেশ উন্নতি হয়েছে। এই গ্রামে ধনঞ্জয় না এলে হয়তো মাইনর স্কুলটা এত তাড়াতাড়ি গড়ে উঠতে পারত না। গাঙচিলার থেকে যে রাস্তাটা বরবরি অবধি গেছে তার জন্য সে গ্রামের লোকেদের কাছে থেকে সই যোগাড় করে কেমন করে সরকারের সঙ্গে অনেক লড়েছে—শুনলে অবাক হ'তে হয়। তার চেষ্টাতেই গাঙচিলা গ্রামে একটা পশু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়েছে, একথা লোকে অস্বীকার করতে পারে না। এখন গ্রামবাসীর মত নিয়ে সে একটি সমবায় সমিতি খুলতে চাইছে। ওর চেষ্টা না হলে গ্রামের চাষীরা সরকারের কাছ থেকে চাষের জন্য বারে বারে ভাল শস্যের বীজ ও সার পেত না।

পঞ্চাশ সালের কোন এক মাসে সে হঠাৎ গাঙচিলায় এসে হাজির। গ্রামের কয়েকজন লোকের কাছে গিয়ে সে বিনীতভাবে বলে যে সে এসেছে উজানি আসামের কোন এক শহর থেকে। সরকারী চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছে এখানে—রোজগারের পথ খুঁজে। ম্যাট্রিক পাশ। তারোপরি সে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও জানে। গ্রামবাসীরা ওকে গ্রামের পশুশালার কাছে একটা ঘর তৈরী করে দেয়।

তার পর থেকেই গ্রামবাসীরা ওর আচরণে মুগ্ধ। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে পয়সাও কিছু পেল ধনঞ্জয়। সোনাইপারের দুঃখী লোকেদের কম পয়সার হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ছাড়া দামী ডাক্তারী ওষুধ কেনার সাধ্য কোথায়? ছোট ছেলে মেয়ে এবং প্রসূতি মেয়েদের জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধই আসল। ধনঞ্জয় কেবল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে বললেই ভুল হবে। ওষুধ আর পথ্য দেওয়ার সময় সে চিকিৎসা শাস্ত্রের জাত কুল বিচার করে না। সে

আসলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হলেও ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন দেয়। কাসি হ'লে চ্যবনপ্রাস খেতে বলে। রোগী দুর্বল হলে তাকে দেয় সারিবার্দি সালসা। গ্রামে হাসপাতাল নেই, রাস্তা কাদা মাটি মাখানো। এমন রাস্তা মাড়িয়ে ডাক্তার আসতে চায় না বলেই এমন জায়গাতে ধনঞ্জয়ই একমাত্র চিকিৎসক—অসহায়ের সম্বল।

গ্রামবাসীরা ওকে যে জায়গায় ঘর তৈরী করে দিয়েছিল, সেই জায়গাটা সে সুন্দর করে তোলে। জমি টুকু ছিল ধুলারাম সইকীয়ার। সে টাকা দিয়ে জমিটা কিনে নেয় আর নিজের নামে মেয়াদী পাট্টা করিয়ে দলিল করে নেয়। চার কামরায় ঘর একটা তৈরী করে। তার একটা কামরায় রোগীর পরীক্ষার জন্য যন্ত্রপাতি রেখে দেয় সে। আস্তে আস্তে সে স্টেথোসকোপ, আলমারী আর সাইকেল কিনে নেয়। মাইনর স্কুলে হেড মাষ্টার হওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা এই বছর খুবই ধরাধরি করেছিল। এই অনুরোধ সে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে বলে—এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায় না।

এত দিন ধরে সে গ্রামবাসীদের সেবা করে আসছে।—একমনে চিকিৎসার বই পড়েছে অনেক। রোগীর জন্য খেটে আত্মসন্তুষ্টিও লাভ করত। পুরানো দিনের অসহনীয় ঘটনাগুলো তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতো বলে এখানে এই গাঙচিলা গ্রামে এসে বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছিল। গতকাল বাসন্তীর কাছ থেকে এসে ও বেঁচে থাকার গভীর অর্থ খুঁজে পায় আর ওর হতাশা বেড়ে যায়। ওর এই আত্ম-সন্তুষ্টি, মনোযোগ আর বাস্তবকে নিরাসক্তভাবে গ্রহণ করার ক্ষমতা সহসা শিথিল হয়ে পড়ে। মনের গোপন কোণে নানা ভাবনার উদ্রেক হ'ল। ও নিজেকে নিজে বোঝার চেষ্টা করে। মনে নানা প্রশ্ন জাগে—প্রকৃত সুখ কোথায়? হরি ভক্তিতে না হরির কাছে আত্মসমর্পণ করায়, না কি স্বামীজির মত মানব সেবায়? দরিদ্র নারায়ণের পূজোতেও হয়তো হতে পারে। ওর মনে অনুশোচনার শেষ নেই। সে যদি আরও পড়াশোনা করার

সুযোগ পেত! এখনও যদি বই পড়ার সুযোগ পেত, তাহলে ওর কত প্রশ্নেরই না উত্তর খুঁজে পাওয়া যেত। হয়তো আংশিক উত্তর। জীবনধারার আকস্মিক পরিবর্তনে কোন সুশৃঙ্খল নিয়ম বা সনাতন সমাধান হয়তো নেই। তবুও সে লোকের সুখে সুখী। এই সুখ আত্ম-ব্যাপী। যন্ত্রণা কষ্টই ওর সুখানুভূতির জ্ঞান বাড়িয়েছে।

আজ সে আগামীকালের কথা ভেবে আরও সচেতন হয়ে পড়েছে। বাসন্তীকে ওর মনের কথা বলে ভুল করে নি তো? নিশ্চয় করে নি, কারণ ওর কথায় বাসন্তী খুব সহজভাবেই সাড়া দেয়। হয়তো এই সাড়া দেবার জন্যই ও ততদিন ধরে দিন গুণে আসছিল।

নিজেকে বোঝার জন্য ও আগেকার ঘটনাগুলি স্মরণ করে। ছোট দুটি ঘটনা। একটা বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ। গাঙচিলা গ্রামের সরুকণের সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল। চৌদ্দ দিনের মাথায় আরও বেশী বাড়াবাড়ি হওয়াতে সেদিন রাত জেগে সে রোগীর কাছেই ছিল। আগের দিন রাত্রে রোগী ভুল বকছিল। কিন্তু দুদাগ ওষুধ খাওয়ানোর পর ঘুমিয়ে পড়ে। একটু বিশ্রাম পেয়ে তার স্ত্রীও কাছেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোগীর স্ত্রী যুবতী। ঘুমিয়ে পড়ায় অসাবধানবশত ওর গায়ের কাপড় সরে গিয়েছিল। লম্ফের মৃদু আলোতে ওর সুগোল শুভ্র লোভনীয় উরুপ্রদেশ আর অর্ধাবৃত বক্ষস্থল ওকে উন্মনা করে তোলে। ধনঞ্জয় ভেবেছিল, এখন যদি ওর হাতটা ধরে আর আলোটা নিভিয়ে দেয়, তবে মেয়েটি নিশ্চয়, ওর ইচ্ছাতে ধরা দেবে। এই চিন্তা মুহুর্মুহু ওকে উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছিল। ক্ষণেকের জন্য সে ভুলে যায়—সোনাইর উত্তর পারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তার ভবিষ্যৎ ও সাময়িক খ্যাতি। কিন্তু হঠাৎ অজানা এক শক্তি এসে বাধা দেয় তাকে। সে ভাবে—মেয়েটি এখন অসহায়। সেজন্য হয়তো উপায় না পেয়ে নিজের দেহ-সত্তার ওর কাছে সঁপে দেবে। হয়তো এই মনে করেই সঁপে দেবে যে তার বিনিময়ে তবুও ওর স্বামী বেঁচে উঠুক। আর ওর স্বামী সরুকণ যখন

সুস্থ হবে, তখন সে গোপনে আজীবন ঘৃণা পোষণ করবে ধনঞ্জয়ের প্রতি। একটি মেয়ের ঘৃণা ওর সমগ্র সত্তাকে কলুষিত করে তুলবে। এটা নীতির প্রশ্ন। নিজের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সে হীন কাজ করতে পারে না।

মনকে দমন করে ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ করে সে চুপিসাড়ে রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। পরের দিন গ্রামের সবচেয়ে প্রধান বৃদ্ধ শ্রীধর বায়েনের কাছে গিয়ে হাজির হয়। শ্রীধর বায়েন জ্ঞানী বৃদ্ধ। বয়স চার কুড়ির কাছাকাছি। গ্রামবাসীর ঝগড়া-বিবাদ তিনি মিটিয়ে দেন। ধনঞ্জয় তাঁকে বলে—আমি ভেবে দেখেছি, কিছুদিন এইসব কাজ থেকে দূরে থাকি, আমার নিজের উপর অশ্রদ্ধা হয়েছে। বায়েন আশ্চর্য হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে। সে খুব আবেগের সঙ্গেই বলে—লোকে আমায় এত ভালবেসে ভুল করেছে। মানুষ মানুষই। মানুষ কখনও দেবতা হতে পারে না। ওর আরও একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল যে, ওর মধ্যেও একটা বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে আছে। কিন্তু একথাটা সে বলতে পারেনি। সে কি বলতে চায় বায়েন তা বুঝতে না পারলেও, ওকে অনেক উপদেশ দিয়ে ওর মনের অনুতাপ প্রশমিত করেছিলেন।

কিন্তু এখন সে ভেবে দেখেছে, বাসন্তীকে সে ওর মনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দিয়ে ভুল করে নি মোটেই। বেঁচে থাকতে গেলে মানুষের দরকার—অযাচিত ভালবাসা এবং সেই ভালবাসা একটু কামাসক্তপূর্ণ। আর বাসন্তী যে ওকে ভালবাসে—এই কথা ওর চোখ বলে, মুখ বলে, ওর দেহভঙ্গিমা বলে, ওর মনের ভাষা বলে। ধনঞ্জয় ওকে নিয়েই নীড় রচনা করবে বলে ভেবে রেখেছে।

দুপুরবেলা সে সোনাই পার হয়ে দক্ষিণ পারে যায়। এবারে সে সাইকেল আনে নি সঙ্গে। বাসন্তীর বাড়ী যেতে ওর সঙ্কোচ হ'ল। আগে ভোগরামের বাড়ী যাওয়া আর এখনকার যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। ওর এমন মনে হয়, এখন যেন ওদের বাড়ীতে গেলে ওদের বাড়ীর সবাই, এমনকি দেওয়ালের ফুটোগুলোও লক্ষ্য করবে ওকে।

সোনাই-র পার দিয়ে হেঁটে ও ঠান্নুয়া ঘাটে এসে হাজির। হঠাৎ সে চমকে ওঠে। এতখানি সে আশা করেনি মোটেই। ঘাটে কলাগাছ একটার নীচে বাসন্তী চুপচাপ্ বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছে। সে ডাক দেয়—বাসন্তী। ও চমকে উঠে দাঁড়ায়, বলে—ও, আপনি।

ধনঞ্জয় আদেশের সুরে বলে—বস। বাসন্তী বসে। সে আবার বলে—তোমাকে কিছু বলব ভাবছি। না বললে আমি হয়তো শান্তি পাব না। আমি ভীষণ একা। আর খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, কতকগুলো দুঃখের কথা তোমায় বলতে আমার ভাল লাগবে।

এই বলে সে বসে পড়ে। ভর দুপুর। সোনাই-র পার নিস্তব্ধ। দূরের থেকে গাঙ চিলের ডাক ভেসে আসছে। সেই ডাক নীরবতাকে মুখর করে তুলেছে। খুব কাছেই মাছরাঙ্গা ডাকছে। বাতাসে ওপারের বাঁশবন দুলছে। কতকগুলো নৌকা একটা সুতোর মত হয়ে মিলে গেছে পশ্চিম দিগন্তে। যুবক-যুবতীর তরুণ হৃদয় দুটি দুরুদুরু কাঁপছে। ওরা আত্মহারা। ধনঞ্জয় বলে—বাসন্তী, এখনও তো তুমি জান না আমি কে?

—আর বেশী জানার কি দরকার, উত্তর দেয় বাসন্তী।

ধনঞ্জয় তখন বাসন্তীর কাছে ওর নিজের দুঃখের কথা বলে মন হাল্‌কা করে নেয়।

—বাসন্তী, তুমি হয়তো জান না, এইভাবে সমাজের কাজ করে আমি নিজের দুঃখ ভুলে থাকি।

—তা, কি করে হয়?

—সত্যি বলছি। অনেক দিন বাদে সত্যি কথা বলে যেন স্বস্তি পাচ্ছি। লোকদের যেমনভাবে বলেছি, তেমনভাবেই তারা বিশ্বাস করেছে। সোনাইপারের লোকেরা এত সরল। সেইজন্যই এই জায়গাটাকে নিজের জন্মস্থানের মতই লাগে। ওরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে নি কখনও, কেন আমি নিজের জায়গা ছেড়ে চলে

এসেছি, আমাদের পরিবারে কে কে আছে এই সমস্ত কোনদিন ওদের মনে স্থান পায়নি।

—তারপর।

—হ্যাঁ বলছি, আমার জীবনটা তোমার সামনে তুলে ধরি, তাহলে হয়তো আমার প্রতি অনুকম্পা হবে তোমার। হয়তো এই কারণেই তুমি আমাকে কখনও ভুলতে পারবে না।

—কেন এমনভাবে বলছেন? আমার খারাপ লাগে না বুঝি?

—তোমার শুনতে ভাল লাগছে বাসন্তী?

—খুব ভালো লাগছে।

বাসন্তীর দুচোখ ছল্‌ছল্‌ করে। ধনঞ্জয়ের গলার স্বর কাঁপা কাঁপা, অস্থির ও আকুলতায় ভরা।

বাসন্তী তার বুকে আশ্রয় নেয়। সে মাঝে মাঝে তার সরু আঙুল দিয়ে হাত বুলিয়ে দেয় গায়, ওর রেশমের মত মিহি চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল বুলিয়ে দেয় ধনঞ্জয় আর ওর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা বলে যায় ওকে।

লক্ষীমপুর গ্রামে ওর বাড়ী। ছোটবেলাই বাবা মারা যান। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে থেকেই মা আর বোনকে প্রতিপালন করে। দুঃস্থ অবস্থার মধ্যেই মা কোনরকমে ওকে হাইস্কুলের দুই-শ্রেণী অবধি পড়ান। কিন্তু মা বেশীদিন বাঁচেন নি। জ্যাঠামশায় লোক ভাল নয়। ওকে আর ওর বোনকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না যেন। কেবলই ওদের খোঁটা দিয়ে কথা বলতে থাকেন। সে স্কুল ছেড়ে রাখাল হয়ে যায়। বোনও ঝিয়ের মত দিনরাত কাজ করে। কত দিন যে ওরা মনের দুঃখে ক্ষিধের ভাত এক মুঠোও খেত না, কেউ তা জানত না। কত রাত যে ওরা কেঁদে কেঁদে জেগে কাটাত, সেকথা শুনে কারও মনে দয়া হল না। ওদিকে জ্যাঠামশায় কিন্তু ওর নিজের ছেলেমেয়েদের খুবই আরামে সুখে মানুষ করতে লাগলেন। ওদের কাপড়-চোপড়, পোষাক-আষাক, খাওয়া-দাওয়া সবই ধনঞ্জয় ও তার বোনের চেয়ে অনেক তফাৎ। এইসব কথা যখন বড় হয়ে সে

বুঝতে পারে, তখন কতদিন ও মায়ের শবদাহের জায়গাটিতে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। কেঁদে কেঁদে মনের কথা বলেছে। শ্মশানের ভারী বাতাস ওকে আরও বেদনাময় আরও অসহনীয় করে তোলে। কিন্তু ভগবান তার প্রতি সদয় হলেন না। স্বর্গে গিয়ে মৃতা মার আত্মাও যদি ওকে আশীর্বাদ দিয়ে থাকে তবে সে আশীর্বাদও ঠিকমতো ফললো না। ওর বোন মনতরার উপর জ্যাঠাইমার অত্যাচার দিন দিন বাড়তেই থাকে। সেও ঘরে ঢুকে ওর কান্না শুনে, পরে আর তা সহ্য করতে পারত না। একদিন সে চুপি চুপি মনতরাকে বলে—আমি বাড়ী থেকে এদের একদিন দেখিয়ে চলে যাবো। এরা কোনদিন আমাকে থাকতে বলবে না। কোথাও চাকরী একটা খুঁজে নিয়ে কাজ করব আর তোকে নিয়মিত টাকা পাঠাবো। এদের কথায় না বেশী কান না দিয়ে চুপচাপ থাকিস, আমার অবস্থা ভালো হলে আমি এসে তোকে নিয়ে যাবো। আর একদিন নির্ভয়ে এসে আমাদের জমিজমার ভাগ চাইব। না দিলে আদালতে নালিশ করব। মনতরাও ওর কথায় সায় দেয়। সে ঘর ছাড়ল। সোজা ডিব্রুগড়ে চলে এসে চায়ের দোকান একটায় ঢুকে অন্য জায়গায় কাজ খুঁজে বেড়াল। এরকমভাবে দুটো মাস শুধু শুধুই পার হয়ে গেল। কিন্তু ওর মনের জোর বেড়ে যায়। এক কুড়ি টাকা পকেটে নিয়ে সে আবার বাড়ীতে আসে। ওর আর চায়ের দোকানে কাজ করার ইচ্ছা নেই। ওকে দেখে জ্যাঠামশায় একটুও মায়াদয়া দেখালেন না। ওঁর স্ত্রীকে ডেকে ওকে শুনিয়ে বলেন—ও আর কোথায় যাবে? ওর কত ফুটানি বেড়েছে, সেদিনকার এইটুকু ছেলে ওর বাবার সম্পত্তির ভাগ চাইতে এসেছে। বাড়ীতে ওর সঙ্গে কেউ কথা বলে নি। এমন কি, ওর সমবয়সী জ্যাঠতুতো ভাই নরেনও ওর সঙ্গে কথা তো বলেই নি, ওকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। মনতরা ওকে দেখে কেঁদে ফেলে। ধনঞ্জয় কিন্তু কাঁদেনি। সে অযথা কঠিন হয়ে পড়ে। মনতরার হাতে পনের টাকা দিয়ে সে বলে, মন, তুমি একজোড়া ভাল কাপড় কিনে

নিও। এই বলে আর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে বাকী পাঁচটা টাকা সম্বল করে জীবন সংগ্রামের জন্য বাইরের নিষ্ঠুর পৃথিবীর উদ্দেশ্যে আবার বেরিয়ে পড়ে ধনঞ্জয়।

এইবার আর সে ডিব্রুগড়ে গেল না। মরাণ পর্য্যন্ত ট্রান্সপোর্ট বাসে টিকিট কাটে। বাসের কণ্ডাক্টর ওর পরিচিত। কারণ সে যখন চায়ের দোকানে কাজ করত, সেই দোকানে প্রায়ই এই লোকটা যেত। খোয়াঙে যখন বাসটা থেমেছিল, সে তখন ধনঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও কোথায় যাবে। কণ্ডাক্টর লোকটি বড়ই পরদুঃখকাতর। ধনঞ্জয়কে দেখেই সে বুঝতে পেরেছিল সে ও বড় অসহায়। ধনঞ্জয় কোথায় যাবে জেনে নেয় আর ওর দুঃখের কথাও গভীর সহানুভূতি দিয়ে সে শোনে। কণ্ডাক্টারটি ছেলেমানুষ। বয়স বড়জোর একুশ বাইশ হবে। ধনঞ্জয় সীট পেয়েছিল কণ্ডাক্টরের কাছেই। বাসে যেতে যেতে সে ধনঞ্জকে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কতদূর পড়েছ? —ক্লাস এইটে চার মাস পড়েছি মাত্র, ধনঞ্জয় উত্তর দেয়। সে বলে, আচ্ছা, তাহলে তোমার জন্য আমি একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেব। আমি তোমার মতই অসহায়। আমি এই কাজ করি কেবল পেটের দায়েই নয়, ভবিষ্যতের জন্যও। আমি ট্রান্সপোর্ট অফিসে বলে এমন ব্যবস্থা করে নিয়েছি, যাতে চারটার আগেই আমি ডিব্রুগড় পৌঁছে যেতে পারি কারণ আমি রাত্রে কলেজে পড়ি। এইবার আই. এ. দেব। শুনে ধনঞ্জয় আশ্চর্য হয়। কণ্ডাক্টর হয়েও রাত্রে এই কলেজে পড়া ছেলেটার তাহলে অসীম মনোবল। কণ্ডাক্টর ছেলেটির কথায় ওরও মনে বল পায়। এইসব দুঃখ-বিপদ তো আছেই, আমাদের মত লোকের যত বিপদ আসবে তত বেশী দৃঢ় হতে হবে। নাহলে আমাদের নিস্তার নেই। বড় হওয়া যায় কেবল ছোট অবস্থা থেকেই। এই কথাগুলোই ধনঞ্জয়কে মনে খুব জোর দেয়। কণ্ডাক্টর ওকে সত্যি সেদিন একটা কাজে ঢুকিয়ে দেয়।

চায়ের বাগান থেকে পেন্সনপ্রাপ্ত একজন ডাক্তার নতুন করে একটা ফার্মেসী খোলে। সামান্য পরিমাণে কিছু ওষুধপত্র আছে।

ওঁকে সাহায্য করবার জন্য ছেলে একজন চাই। অবশ্যি কম্পাউণ্ডার একজন রাখার শক্তি তাঁর নেই। ইংরাজী অক্ষর জানে বা পড়তে পারে এমন ছেলে একটা হলেই হল। যাতে ওকে শিখিয়ে দিলে মিক্সচার বানাতে পারে আর ওঁর অনুপস্থিতিতে গ্রাহককে ওষুধ বিক্রী করতে পারে। কাজেই কণ্ডাক্টরটি যখন ধনঞ্জয়কে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল, উনি বেশ খুশীই হলেন। মাসে কুড়ি টাকা মাইনেতে ধনঞ্জয় ফার্মেসীতে ঢুকল। সেই সময়ই ও চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু কিছু বিষয় শিখে নেয়। ফার্মেসীতে থেকেও সে বুঝতে পারে যে, অনেক লোক আছে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই পছন্দ করে। তাছাড়াও কতকগুলো রোগে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা খুব কাজ দেয়। মরাণের পশ্চিমদিকে যে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারটি আছেন তার রোজগারও বেশ ভাল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শেখাও সুবিধা। কারণ বাঙলা বা অসমীয়াতে এর বই আছে, পাওয়া যায়। মরাণে থাকাকালীন ও এই ধরণের দু'চারটে বই কিনে পড়েছিল।

মরাণে থেকে ওর ভালো লাগলেও, ধনঞ্জয় ভাবে যে এরকমভাবে থাকলে ওর কোন উন্নতি নেই। দু'একজনকে বলে কয়ে ও দূরবর্তী গ্রাম একটার পাঠশালার পণ্ডিতের কাজ নেয়। কারণ, পণ্ডিতের কাজ করলে স্কুলে না গিয়েই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার নিয়ম আছে। পরে সেখানে থেকেই ও ম্যাট্রিক পাশ করে। ওর আশা আরও বেড়ে যায়। সেই কণ্ডাক্টারের মতই কলেজে পড়তে চায়। নতুন একটা অফিসের (স্ট্যাটিসটিক্সের অফিসে) ও কেরাণীর কাজে ঢোকে। আগষ্ট মাসে কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবছিল—হঠাৎ আবির্ভাব হল সেই প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের। কত লোক যে মারা গেল, কত গরু মোষ লুইতে ভেসে গেল তার অন্ত নেই। কত লোক যে চিরদিনের জন্য দুর্ভাগা হয়ে গেল তার কি কোন হিসেব আছে ?

এতদূর বলে ধনঞ্জয় কিছুক্ষণ নীরব থাকল। বাসন্তী কখন তার বুক থেকে নিজের মাথাটা সরিয়ে নিয়ে গালে হাত দিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে ওর কথা শুনছিল, তা এতক্ষণে ধনঞ্জয় টের

পেল। ও হঠাৎ বলে ওঠে—ধনদা। নিজেই নিজের গলা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় বাসন্তী। সে আস্তে করে বলে—তোমার কি খারাপ লাগছে, বাসন্তী ?

—না না, মোটেও না। আপনি বলে যান।

—আমার আরও বেশী দুরবস্থার কথা শুনে দুঃখ পাবে না তো ?

—পাব, কিন্তু আর আমি শুনব না·····”

—শোন, আর আমার বোনের জন্য একটু চোখের জল ফেল।

— কেন, আপনার বোন ভূমিকম্পে মারা গেছে নাকি ?

—না, না মারা যায়নি। মরলেই ভাল ছিল।

ভূমিকম্পের প্রচণ্ড প্রকোপে আমার ওর কথা বারবার মনে হয়েছিল। ভেবেছিলাম ওর কি হল ? বাড়ী গিয়ে দেখি আমাদের ভিটেমাটি ভূমিকম্পের করাল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন। লুইত ওকে ভাসিয়ে নিয়েছে। যে মাঠটা আমাদের চাষের জমি ছিল, সেই মাঠটা শুকনো বালিতে ভরে যায়। সেখানে আর কোন কালেই চাষ হবে না। লুইতের জল গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠে গিয়ে পৌছেছিল। ওটা লুইতেরই কীর্তি।

—আপনি বাড়ী গিয়ে কাউকে দেখতে পেলেন না ?

—কে কোথায় গেল, কেউ বলতে পারে না! মাসখানেকের মাথায় খবর পেলাম, জ্যাঠামহাশয় নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিবসাগরে তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে চলে যান। সেখানে তিনি চা বাগানের কাজ একটাও যোগাড় করে নেন।

—আর মনতরা ?

ধনঞ্জয় এইবার খুব বিচলিত বোধ করে। দুবার ঢোঁক গিলে শোকটাকে হালকা করার চেষ্টা করে আর বলে—কি বলব ? এটা আমারই দোষ। শুনেছি, মাস ছয়েক আগে জ্যাঠামহাশয় অনেক টাকা নিয়ে ওকে বুড়ো একটার সঙ্গে বিয়ে দেয়। ও লেখাপড়া জানে না। আমাকে একটা খবরও ও পাঠাতে পারল না বেচারী। ওকে জোর করে হোমের সামনে বসানো হয়েছিল।

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাসন্তী। ধনঞ্জয় লক্ষ্য করে ওর চোখে ছফোঁটা জল চিকচিক করছে। ও হাতে ধরে একটু নাটকীয় ধরণেই বলে—এত শোনার পর কতটা ধৈর্য থাকলে তবে আমি আবার শহরে আসতে পারি? মনতরাই আমার একমাত্র ভরসা ছিল। ওরই যদি এই অবস্থা, আমি আর কার জন্য এত খাটবো আর আমার বড় হওয়ারই বা দরকারটা কি?

সে ওর বাহু থেকে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে নিজেই বলে—সেদিন লুইতের বালিয়ারিতে বসে আমিও হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম আমি যদি শিবসাগর ও লক্ষ্মীমপুরে যে কোন একটা টাউনে থাকি তাহলে আমি হয়তো কোন একদিন মনতরার দেখা পাব আর আমিও তখন ওর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে দমন করতে পারব না! আর ওর সঙ্গে দেখা হলে আমি কি বলেই বা সান্ত্বনা দেব। ওকে একটা বুড়োর বৌ হিসেবে দেখে আমিই বা সহ্য করব কি করে?

এইবার সে আবার চুপ করল। শ্রান্ত, ক্লান্ত ওর দেহ ও মনের অবস্থা বাসন্তী ওর খুবই কাছে দাঁড়িয়ে ওর মাথায় হাত বোলাতে থাকে। সে খুব আস্তে আস্তে বলে—সেজন্যই অনেক ভেবে চিন্তে আমি এখানে চলে এসেছি। এটা আমার অজ্ঞাতবাস। এখানে থাকলে নিশ্চয়ই জ্যাঠামহাশয়ের কথা শুনতে পাব না আর মনতরাও আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

বাসন্তীর ঠোট ছটো কেঁপে ওঠে। ও কিছু একটা জিজ্ঞাসা করতে চায়। কিন্তু কথাটা ওর মুখের ভিতরেই থেকে যায়। ওর জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা ছিল, তুমি তো অনেক জায়গায় ছিলে আর ঘুরে বেড়াচ্ছ, কোনদিন যদি সোনাইর পার ছেড়ে চলে যাও। কিন্তু কথাটা বাসন্তী বলতে পারে না। ভেবে নিল ও সোনাই ছাড়তে পারবে না। কারণ সে ওকে ছাড়তে পারবে না। ধনঞ্জয়ের মনে হল, বাসন্তী যেন ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাইছে, মনে হল হয়তো ওর কি জাত তাই জানতে চায়। সে নিজে থেকেই বলে—অনেক কথাই বললাম, কিন্তু আমার বংশ পরিচয়ই দিলাম না। বাসন্তী,

আমার জাত কি জান? বাসন্তীর বুকটা হঠাৎ তোলপাড় করে ওঠে। কি জানি হয়তো ও আশা করেনি যা এমন জাতও তো হতে পারে। যদি সে নীচুজাতের হয় ও খুব বিচলিত আর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। ধনঞ্জয় খুব বিতৃষ্ণার সঙ্গে বলে, আমি জাতে ব্রাহ্মণ। সময় মত আমাদের উপবীত ধারণ করতে হয়। ছোট থেকেই শুনে আসছি—ব্রাহ্মণেরা নীচুকুলের লোককে ছুঁলে স্নান করতে হয়।

বাসন্তী চোখ দুটো বুঁজে ফেলে। দূরে দাদা ভোগরামের গলা কানে আসায় ও ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দুজনে দুদিকে চলে যায়।

চার

গতকালের কথা ভেবে বাসন্তী রোমাঞ্চিত বোধ করলেও ওর একটা কথায় বড়ই অনুতাপ হচ্ছে। ও কি ভুল করল শেষ অবধি? একথাই বারে বারে মনে হচ্ছে ওর। দৈববলে কিছুক্ষণের জন্য ওর সঙ্গে বাসন্তী নিরালায় কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল। আর প্রথম দিনই ও কোন ধনঞ্জয়কে ওর হাতে হাত রাখতে দিয়েছিল? ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই ওকে খুবই সস্তা মেয়ে বলে ভেবে নিয়েছে? ওর মাথায় হাত বোলানটাও কি খারাপ হয়েছে তাহলে?

নানারকম যুক্তি দিয়ে বাসন্তী নিজেকে সান্ত্বনা দিল। নাঃ, ও ভুল করেনি। সে ওর সামনে নিজের কথা বলার জন্য নিশ্চয়ই উৎসাহ পেয়েছিল। দু একটা কথা বলে ও আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়েছিল বাসন্তীর মনে হচ্ছিল যেন ওর এই আঙুলগুলোই ওকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। ওর চাঁপাকলির মত আঙুলগুলো ও দুহাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তখনই সে তার মনের দুঃখের কথা বলতে পেরেছিল। ওর স্পর্শকাতর যন্ত্রণাগ্রস্ত মন যেন ওকে স্পর্শ করেই ওর অসহায়তার মুক্তি চেয়েছিল। ও ওর হাতখানা উজাড় করে

ধনঞ্জয়ের হাতে সমর্পণ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। তখন ওর মনে হয়েছিল ওর আঙুলগুলো যে সুন্দর সে আজই তা টের পেল। পুরুষের প্রথম স্পর্শে ওর বুক টিপটিপ করছিল, মনে জোয়ার ভাঁটার উদ্রেক হয়েছিল আর সারা শরীর শিরশির করছিল। ও নিজেকে ভুলে গিয়েছিল। ধনঞ্জয়ের মুখখানা যে এত সুন্দর। ওকে খুবই সরল ও নিরপরাধী মনে হয়েছে বাসন্তীর। ওর মুখে শিশুর পবিত্রতা। যখন সে ওর বোনের কথা বলছিল তখন ওর পা দুটো কাঁপছিল। চোখ দুটো ভয়ানক বিদ্বেষে ছোট বড় দেখাচ্ছিল। গলার স্বরও কেঁপে কেঁপে যাচ্ছিল। বাসন্তী ভাবে—ও যখন একলা থাকে, তখন ওর এইসব কথা মনে পড়লে নিশ্চয় ও চোখের জল ফেলে। ওর প্রতি খুবই মায়া হয়েছিল বাসন্তীর। ওর দুঃখে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছিল আর সেজন্যই অতর্কিতে অজান্তে ওর হাতটা এগিয়ে গিয়েছিল ওর চুলের দিকে। ও খুব আদর করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তখন ধনঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর বাসন্তীর হাত ধরে ফেলে। ওর সেই হাতের মুঠোতে কত উত্তাপ কত সংকল্প কত ব্যাকুলতা। সেই অনুভূতি এখনও ভুলতে পারছে না বাসন্তী।

এখন ও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে যে—নিজেকে ছুঁতে দিয়ে ওকে, একটুও ভুল করেনি—ওর মায়ায় হাত বুলিয়ে দিয়েও ভুল করেনি বাসন্তী। কিন্তু একটা ভুল করেছে। ওকে স্পর্শ করার সময় বাসন্তীর ওকে একটা প্রণাম করা উচিত ছিল এবং তার দ্বারাই ওকে বুঝিয়ে দিতে পারত যে আজ থেকে বাসন্তী ওরই। হ্যাঁ, ওরই সঙ্গে তো বাসন্তী সংসার করবে আর এই জীবনে ওই একমাত্র আপন হয়ে যাবে বাসন্তীর কাছে। ওর সুখ-দুঃখের সমভাগী হবে বাসন্তী। বাসন্তীর সুখ দুঃখ সমান ভাগ নেবে ধনঞ্জয়। দুজনের আর আলাদাভাবে দুঃখ কিছু থাকবে না তখন। দুজনে একসঙ্গে ছেলেমেয়ের চিন্তা করবে। দুজনে একসঙ্গে বুড়োবুড়ি হবে। দুজনের এক মত থাকবে। জীবন সম্পর্কে এক ধারণা গ্রহণ করে মরণ পর্যন্ত নিরাসক্তভাবে পথ চেয়ে থাকবে দুজনে। এই ধারণাগুলো মনের

মধ্যে ওকে প্রণাম করে স্বামী হিসাবে বরণ করে নেওয়া উচিত ছিল ওর সেদিন। আর তা না করে আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ওর বুকে মাথা রেখে আর ধনঞ্জয়ের আদর পেয়েই মন জুড়িয়ে গিয়েছিল ওর। ওইটুকু ওর ভুল হয়েছিল। কিন্তু ওর অতখানি সংযত হওয়ার ধৈর্য ছিল না। সোনাইপারের মেয়ে ও। এটা হয়তো সোনাইপারের জলবায়ুরই দোষ। দুপুরের সেই নির্জন পরিবেশে, উলুবন আর কাঁশবন কাঁপিয়ে তোলা বাতাসের মৃদু হিল্লোলে, দূরের দিগন্তের শ্যামলা বিস্তৃতির মাঝে, সোনাইর অবিশ্রান্ত স্রোতের কলতানে বাসন্তী হারিয়ে গিয়েছিল। মনোরম সেই প্রকৃতিতে ধনঞ্জয়কে তারই এক আপন হিসেবে দেখেছিল বাসন্তী। বাসন্তী ওর প্রাণ নিঃসংকোচে সমর্পণ করে ধনঞ্জয়কে।

মায়ের প্রতি ওর ভক্তি ও ভালোবাসা আরও বেড়ে যায়। এই বাড়ীটা ওর তো একদিন ছেড়ে চলে যেতে হবে। ও যে বাড়ীতে জন্মেছে, সেইটা ছেড়ে যাওয়া যে কত শক্ত, কত কঠিন কাজ। কত মায়ার বন্ধন এখানে।

চোখের ছানি কাটানোর পর থেকেই মায়ের আচরণের অনেক পরিবর্তন হয়। তিনি আজকাল প্রায়ই উপদেশ দেন মেয়েকে— বলেন, দেখ মা, আমার মৃত্যুদিন ঘনিয়ে এলো, যাবার আগে তোর বিয়েটা দেখে যেতে পারলে ভালো হ'ত।

একজনের হাঙ্গামা শেষ হলই। ছেলেও নিজে সমর্থ হয়ে উঠেছে। এখন শুধু তোর জন্যই চিন্তা আমার। বাসন্তী খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনে যায়, কিন্তু কিছু বলে না।

আজকে ঘুমোবার সময় মা বাসন্তীকে বলেন—বাসন্তী, তুই আজকাল আলাদাভাবে ঘুমোস কেন, আমার সঙ্গে ঘুমোতে ভাল লাগে না বুঝি ?

বাসন্তী উত্তর দেয়—কেন মা খোঁটা দিয়ে কথা বল ? তোমার অসুবিধে হবে বলেই কাছে শুইনে।

—মার বুকে মেয়ে শুলে কোন মার খারাপ লাগে শুনি ? আজকাল

আমার মনটাও বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। বাসন্তী বুঝতে পারে, ও যদি মায়ের সঙ্গে না শোয়, তাহলে মা খুবই দুঃখ পাবেন। ওর বৌদিও মায়ের ইচ্ছার কথা জানতে পারে। বলে—বাসন্তী, তুই মায়ের সঙ্গে শুস্ না কেন ? এই বাড়ীটাতে আর কদিনই বা থাকবি ? মেয়ে বড় হলেই একখানা পা আরেকটা বাড়ীতে এগিয়ে দিতেই হয়। বৌদির ইংগিত বুঝতে পেরেই মনে মনে বাসন্তীর ভালো লাগলেও, মুখে লজ্জা দেখিয়ে বলে—যাঃ।

রাত্রে মাকে অনেক কথাই বলে বাসন্তী। ওর মনে নানা প্রশ্ন, এতদিন মাকে এইসব বলেনি কেন ?

—বাসন্তী, দেখতে দেখতে তুই গাছের মত বেড়ে উঠলি। এখন তুই সোমত্ত মেয়ে। আমি তোর মুখ দেখেই বুঝতে পারছি যে তোর এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। আগের মত তোর মুখে সেই হাসি নেই, কিন্তু এই কথাটা জেনে রাখিস মা—জন্ম, মৃত্যু বিবাহ—এই তিনটে দেবতারও অবিদিত। সেজন্যই আমি এত চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

বাসন্তীর চোখে জল আসে। সে মাকে জোরে জড়িয়ে ধরে বলে—আজকে মা তুমি এসব কথা বলে আমায় দুঃখ দিচ্ছ কেন, আমি কি তোমাদের এতই বোঝা ?

মা একটুও বিচলিত না হয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন—ঠিক বোঝা নয়। আসলে মস্ত বড় একটা বোঝা। তোর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমারই হোক বা তোর দাদারই হোক, কারুরই মনে শান্তি নেই। মেয়েকে উপযুক্ত বয়সে বিয়ে দিতে পারলেই আমাদেরই পুণ্য।

—মা, তোমরা আর যা বলবে, সব শুনবো, কিন্তু এইসব কথা বোল না। এইসব কথা আমায় বলে কি লাভ ?

—এইজন্যেই বলছি, তুই আজকাল ঘাটে অনেকক্ষণ বসে থাকিস। বাড়ীতেও চুপচাপ করে কি যেন ভাবিস।

বাসন্তী এইবার আর কিছু বলতে পারে না। মা যেন সবজান্তা হয়ে বসে আছে। রাত্রে ওর ঘুম হোল না। মা'র বলা কথাগুলো ওর কানে বাজতে থাকে। মা বলেছিলেন—মেয়েরা ভাল হলে যে

কোন পুরুষকে নিয়েই সুখের সংসার করতে পারে। মেয়েদের একবার পা পিছলে গেলে একটা দোষকে ঢাকতে অনেক দোষ ঢাকতে হয় আর সেদিনই ওর সুখ শান্তি চলে যায়। আর একটা কথা মা বলেছিলেন—তবুও ভগবান মেয়েদের অনেক গুণ দিয়েছেন, যে কোনো অবস্থাতেই তারা নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারে।

ছোট মেয়ের মত কোন প্রশ্ন না করেই রাত্রে ও মায়ের কথাগুলো একমনে শুনেছিল পরে যখন গভীরভাবে ও চিন্তা করে তখন ওকে এক নৈতিক সচেতনতা অতিষ্ঠ করে তোলে।

পরের দিন সকালে ও ওর মনের অন্ধকার দূর করতে পারেনি। মায়ের কথাগুলো মনকে নৈতিক সচেতনতায় উৎপীড়িত করে তুলেছিল। কাজের চাপে মনটাকে এককোণে চেপে রাখতে ইচ্ছে করছিল। ঘাটে কাপড় নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ধুচ্ছিল। সকালে কেউ ওঠার আগেই তিন ধামা ধান ভেনেছিল বাসন্তী। সন্ধ্যেবেলা মা আর বৌদির কাছ থেকে দূরে দূরে ছিল। সবগুলো ঘরেই ধুপ জ্বালিয়ে দিয়েছিল। গোয়ালের কাছে যে আবর্জনাগুলো জমে আছে সেগুলোতে আগুন দিয়ে ধোঁয়াগুলো গোয়ালের দিকে উড়িয়ে দিচ্ছিল মশা তাড়াবার জন্য। সন্ধ্যেবেলা তাড়াতাড়ি খেয়ে বিছানায় ভগবানের নাম করতে করতে শুয়ে পড়েছিল। সকালে উঠেই বেশ সজীব অনুভব করে বাসন্তী। রাত্রে ওর খুব ভালো ঘুম হয়েছিল।

ঘুম থেকে উঠে ও রোজ ঘর দোর ঝাঁট দেয়। বৌদি উঠে আগাছা তুলতে থাকলে ও দরজার সামনেটাও ঝাঁট দিয়ে দেয়। পিছনদিকে নারকেল ঝোপের কাছ থেকে ঘাট পর্যন্ত গাছগাছড়ার মাঝে সরু সিঁথির মত যে দুহাত চওড়া রাস্তাটা চলে গেছে সেটাও ঝাঁট দিয়ে দেয়। তারপর গোধুলি-গোপাল গাছ দুটোর গোড়া পরিষ্কার করে দেয়।

আজকেও অন্যদিনের মত সব ঝাঁট দেয়। রাস্তার সামনে যে বকুল গাছ দুটো আছে তার থেকে ঝরে পড়া ফুলগুলো নিয়ে আঁচলে তুলল। একটা মালা গেঁথে খোঁপায় লাগায়। আরেকটা মালা

রাধাকৃষ্ণের ছবিতে টাঙায়। তখন বৈঠকখানা ঘরের অবস্থা দেখে ওর গা ঘিনঘিন করে ওঠে। এতদিন ওর খেয়ালই হয়নি যে বৈঠকখানা ঘরটা নোঙরা আগোছালো হয়ে পড়ে আছে। যে বাড়ীতে বড় মেয়ে আছে তাঁদের বৈঠকখানার ভিতরটা চোখ ধাঁধানো হওয়া উচিত।

দক্ষিণ দিকে পড়ে আছে ধানের বস্তাগুলো। সেগুলো টেনে হেঁচড়ে এককোণে নিয়ে আসে বাসন্তী। আর সেটা যাতে চোখে না পড়ে, তাই কাপড় একটা দিয়ে ঢেকে দেয় তার উপর। উত্তর দিকেয় বেড়াতে যে তক্তাপোষটা আছে তা রঙীন চাদর দিয়ে ডেকে দেয়। বেড়ার খুঁটিতে টাঙানো হরিণের শিঙদুটো পরিষ্কার করে। ছোট টেবিল আর চেয়ারগুলো মধ্যিখানে রাখে। মোড়াদুটো আর পিঁড়ি দুখানা অর্ধ-বৃত্তাকার করে রাখে। টেবিলটা ফুলতোলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। বোতলে জল ভরে একগুচ্ছ ফুল দিয়ে ফুলদানী সাজায় আর টেবিলের উপরে রাখে। মনের এই বহিঃপ্রকাশে নিজে নিজেই অবাক হয় বাসন্তী।

বৌদি কিন্তু কম চালাক নয়। বাসন্তীর এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখে কি যেন সন্দেহ করে। মুচকে হেসে বলে—হ্যাঁ তোর আজকের কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কেউ মেয়ে দেখতে এলে মেয়ে দেখে পছন্দ হওয়া তো পরের কথা মেয়ের সাজানো বৈঠকখানা ঘরটা দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাবে। বাসন্তী অভিমান করে।

বৌদি বলে—আর বেশী দিন নেই, একদিন কেউ এসে হাজির হবে। দাদা একজনকে সম্বন্ধের জন্য পাঠিয়েছে।

—বৌদি, এরকম করে ঠাট্টা করলে ভাল হবে না কিন্তু। তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

—তাই বুঝি, সত্যি কথা বললেও এত রাগ !

বাসন্তীর এখন সকল সন্দেহ দূর হল। বৌদি এরকমভাবে বললেও, বাসন্তীর কথা অন্য কিছু মনে করেনি। যাই হোক,

ধনঞ্জয় ওর বাড়ীতে এলে ও আগের মতনই বেরুতে পারবে ওর সামনে। কথা বলতেও পারবে।

কিন্তু ওদের এই মেলামেশার কথাটা আর বেশীদিন লুকোতে পারে না। শনিবার দিন হাট করে ভোগরাম বেলা যেতে তবে ঘরে আসে। কাজেই সবাই আগেই খেয়ে নেয়। শুধু তরুলতাই স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। ও ঘরের সামনের দিকে খৈ বাছছিল। এখন সময় ওর মেয়ে কোথা থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসে। তরুলতা চোখ পাকিয়ে ধমক দেয়—একলা ঘাটে যেতে বারণ করেছিলাম না? কেন গিয়েছিলি? তোর বড় বাড় বেড়েছে না?

ওর মেয়ে মালচের বয়স সাত। ও বেশী কিছু জানে না। তাই মা রাগ করতেই ভয়ে ভয়ে বলে—আমি একলা যাইনি, বাসন্তী পিসীও গিয়েছিল। তরুলতা বৃথা রাগ সম্বরণ করে প্রসন্ন হয়ে বলে—হ্যাঁ, একলা যাবে না, কারুর সঙ্গে যাবে। ঘাটের পাড়টা খারাপ, বড় ঢালু। পিসী আসেনি?

—না আসেনি। মা, বাবা আমার জন্য আজ রঙীন ফ্রকটা আনবে তো?

তরুলতা মালচের কথার উত্তর না দিয়ে আবার আগের মত রাগ করেই বলে—পিসী এখনও কাপড় ধুচ্ছে?

—না।

—তা হলে কি শালগাছের গোড়া কাটছে?

—পিসীর খুব স্ফূর্তি। খুব হাসছে। লোকটা কথা বললেই পিসী হাসছে। লোকটাও হাসে।

—লোক? কোন লোকের সঙ্গে কথা বলছে? বলছিস না কেন? কি হাঁ করে তাকিয়ে আছিস?

সেই যে ঠাকুমাকে যে লোকটা শহরে নিয়ে গিয়েছিল সেই ডাক্তারটা। আর পিসীর যে কি সাহস! অত বড় লোকটাকে পিসী তুমি বলে ডাকছে।

তরুলতা বড় চিন্তিত হয়ে পড়ে। খৈ-এর কুলোটা সরিয়ে দিয়ে পিছনদিকের উঠোনে আসে এবং ঘাটের দিকে চেয়ে থাকে। বাসন্তীকে ধীরে ধীরে আসতে দেখে। চোখাচোখি হওয়াতে বাসন্তীকে আপাদমস্তক দেখে নেয় এবং শ্লেষের সুরে বলে—তোর ঘাটে এত দেরী হয় কেন, এখন বুঝতে পারছি। এখন দেখছি, মেয়ের পুরুষ দেবতা জুটেছে।

বাসন্তীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

কিছু না বললে খারাপ দেখায় বলে ভয়ে ভয়ে বলে—কি হ'ল ? আমি আবার কি করলাম ?

—আর ন্যাকা সাজতে হবে না ; তোমার কাজের কি এখন আমি কৈফিয়ৎ দেব ? এর বেশী কিছু বলতে চাই না। তোমায় স্পষ্ট কথা বলার কি আমার অধিকার নেই ?

—বৌদি। বাসন্তীর স্বরে মিনতি। বৌদির গলার স্বর এবার গরম, বলেন—কি ?

বাসন্তী ওর অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে বলে, বৌদি তোমাকে যদি আমার বুকটা চিরে দেখাতে পারতাম !

বৌদি মাথা নীচু করে চুপ করে থাকে।

পাঁচ

বাসন্তীর মনের পরিবর্তন হয়েছে জেনেও তরুলতা ওকে সাবধান করে দেয়নি। বাসন্তী কোন সময়ে ঠানুয়া ঘাটে যায় আর কতক্ষণে ফিরে আসে সেদিকেই শুধু নজর দেয় তরুলতা। তরুলতা যে বাসন্তীর উপর খুব নজর রাখছে, আর ওর পিছনে গোয়েন্দাগিরিও করছে, এই কথা বুঝতে বাসন্তীর আর বেশীদিন সময় লাগল না। ও আগের মতই ঘাটে আসা-যাওয়া করতে লাগল। আগের মতই

এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তবুও ওর মনে হতে লাগল যেন ও আগের চেয়ে পরাধীন। ওর আগের ঐ খোলা মন ও দ্বিধাহীন স্বভাবটা প্রেমের গোপন স্পর্শে নিষ্পেষিত দুর্বাঘাসের মত হয়ে ওঠে। সর্বদা অন্তর্মুখী গম্ভীর প্রকৃতির এই মেয়েটা বাইরের জগতের স্পর্শে না এলেও এই প্রথম অনুভব করল যে ও একটা খাঁচার পাখী।

এতদিন যে বৌদি ওকে স্নেহ ভালবাসায় ভরে দিয়েছিল, সেই বৌদিও আজ ওর উপর বিশ্বাস হারাল ওর মনে হয়, কোনদিন যে এই খাঁচার পাখী দূর দূরান্তে উড়ে যাবে, তার কি ঠিক আছে। তিনটে সন্তানের মা তরুলতা সাংসারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, ছেলেমেয়েদের বায়না আবদার মিটিয়ে একেবারেই ভুলে গেছে যে, সেও একদিন যুবতী ছিল আর বাসন্তীর মতনই মন চঞ্চল করা দিন ছিল ওর একদিন। মালচের মুখে বাসন্তীর প্রেম নিবেদনের খবরের ইঙ্গিত পেয়ে তরুলতা বাসন্তীকে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারল না। তরুলতা মনে করে, বাসন্তীকে এই সর্বনাশা পথ থেকে ফিরিয়ে আনা ওর কর্তব্য। তবেই ও বাসন্তীর উপকার করতে পারবে।

তবুও বাসন্তী তরুলতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং ওর কাছে ভয়ে ভয়ে থাকে। কৃতজ্ঞতার কারণ হচ্ছে যে, দুদিন হয়ে গেল, তরুলতা ওর স্বামীকে কথাটা বলেনি। ভোগরামের ব্যবহারের থেকেই তা বেশ বুঝতে পেরেছে বাসন্তী। হয়তো মাকেও বলেনি কথাটা। কারণ মা ওকে আগের কথাগুলোই বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কতদিন বাসন্তী এরকমভাবে থাকবে। একবার যখন ওর হৃদয় থেকে প্রেম উৎসারিত হল, মন সমর্পণ করল একজন অজানা পুরুষকে, তখন আর উপায় কি আছে? নিষ্ঠুর নিয়মে বাঁধা বংশ পরিবারের প্রাচীন গণ্ডী ছাড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে দুর্বার। উন্মত্ত যৌবনে সে ঘরছাড়া বাঁশীর ডাক শুনেছে। তার মন আজ সংস্কারের বেড়া ভেঙে উধাও হয়ে যেতে চাইছে।

একটি গ্রাম্য মেয়ের যতখানি আবেগ ও মনোবেদনা মিশিয়ে ওর মনের কথা হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারে, ততখানি আবেগ মিশিয়ে

মনের কথা ব্যক্ত করে বৌদির কাছ থেকে বাসন্তী সহানুভূতি চাইল। তরুলতা সত্যি ওকে অনুকম্পা করে। ও ভাল মন্দ কিছুই বলল না, শুধু বলে—বাসন্তী আমি তোর মনটা বুঝতে পারছি। একটা কথা বারে বারে আমার মনে হচ্ছে যে, নিজের দেহটা বাঁচিয়ে রাখবি। যতই নেশার ঘোর বাড়বে, ততই অসুখী হবি।

বাসন্তী এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তরুলতা এত সহানুভূতি দেখালেও পরের দিন ধনঞ্জয় আসতে বাসন্তীকে চা এককাপ বা পান একটা দিয়ে ওর সামনে বেরুবার সুযোগ দিল না। তখন ওর বৌদির উপর ভীষণ রাগ হল আর ও রান্নাঘরে ছট্ফট্ করতে থাকে। বৌদির শ্যেন দৃষ্টির জন্যই দরজার ফাঁক দিয়ে ধনঞ্জয়কে একবার দেখে নেওয়ার সুযোগও পেল না বাসন্তী।

তরুলতা বাসন্তীর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে। বাসন্তী সর্বদা নির্জীব হয়ে আছে আগের মত পরিপাটী করে চুল বাঁধে না, আপন মনে গুণগুণ করে বিয়ানাম গাইত, তাও গায়না আজকাল। বনশ্রী রাগের মাধুরিমা হঠাৎ করুণ মূর্ছনায় স্তব্ধ হয়ে গেল। গোপনে তরুলতা শাশুড়ীকে কথাটা বলে। সুজলাকে কিন্তু ওর মত উৎকণ্ঠিত দেখল না। বলেন—তাহলে তো এর একটা ব্যবস্থা করতে হয়। এ সময় আগাছা জন্মালেই উপ্‌ড়ে ফেলতে হয়। না হলেই বিপদ। কার মন কোন দিকে যায় কে জানে? তাছাড়া পুরুষের মন হ'ল ফাল্গুনের বাতাসের মত। মেয়েদেরই শেষ অবধি পস্তাতে হয়।

—আচ্ছা মা ঐ ছেলেটা কেমন হবে?

—তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। দেখতে শুনতে তো ভালই। তার চেয়ে তার বেশী কিছু লক্ষ্য করিনি। কথাবার্তা শুনে যা বুঝেছি সে শয়তান নয়।

বিকেলে বাসন্তী মায়ের কাছে এসে বসে। চোখ খারাপ হবার পর থেকে মা আজকাল আগের মত পুঁথি-পাঁজি পড়তে পারেন না। মাকে পুঁথি পড়ে শোনাচ্ছিল বাসন্তী। কীর্তনের সুর দিয়ে পুঁথি পড়ছিল

বলে, পড়ার সময় জড়তা আসেনি। হঠাৎ বাসন্তী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দরজার গোড়ায় সাইকেলের ঘণ্টা শুনতে পায়। এই ঘণ্টা ওর একান্ত পরিচিত। ক্রিং-ক্রিং করে দুবার বাজিয়ে কিছুক্ষণ বাদে আবার ঘণ্টা বাজে। ও পুঁথি পড়া ছেড়ে দিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মা ওকে প্রশ্ন করে—কেন অধ্যায়টা শেষ করছিস না? কথাটা ওর কানে যায়নি। সমস্ত মন দিয়ে ও বুঝতে পারে যে, সাইকেলখানা ও বেড়ায় ঠেস্ দিয়ে রাখছে। কিছুক্ষণ বাদেই ওর গলা শুনতে পাওয়া যায়। ও উত্তর দেওয়ার জন্য বাইরে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু মা ওর মনের অবস্থা টের পেয়ে ওকে ধমক দিয়ে উঠতে বারণ করেন এবং উনি নিজেই বৈঠকখানা ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। ধনঞ্জয়ের সঙ্গে দু একটা কথা বলে ওকে বিদায় দিয়ে এসে বাসন্তীকে বলেন—তুই কি কাজ করলি মা, তার চোখে আমি তোর সর্বনাশ দেখতে পেয়েছি।

বাসন্তী কাঁদে। মা বলেন—তিন কাল পার হয়ে যায়, এখন আর আমার মানুষ চিনতে বাকী নেই। ধনঞ্জয়কে দেখে এখন মনে হয়—এমন কতকগুলো লোক আছে, যারা সব দিক দিয়েই ভালো, ধনঞ্জয়ও তেমনই। সে ঠিক সংসারের উপযুক্ত নয়। কতকগুলো লোক আছে সংসারী ধরণের নয়। তাঁরা হয়তো স্নেহ, ভালবাসা দিতে পারে ভালবাসা নিতেও পারে, কিন্তু এক জায়গায় বাসা বাঁধতে পারে না। পাখীর মত এখানে ওখানে বাসা বেঁধে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। ধনঞ্জয়ও হয়তো সেইরকম ভেসে বেড়ান লোক।

বাসন্তী আরও কাঁদছিল। পরের দিন সকালে জল আনতে ঘাটে গিয়ে ধনঞ্জয়কে নদীর ওপারে একলা বসে থাকতে দেখতে পায় বাসন্তী। ও বনের হরিণের মত সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিল ধনঞ্জয়ের দিকে। কোন মুহূর্তে যে তরুলতা ওর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, ও তো বুঝতেই পারেনি। তরুলতাকে দেখে ধনঞ্জয় হিজল গাছের ঝোপে লুকিয়ে পড়ে।

অবস্থা খারাপ দেখে মা আর তরুলতা গোপনে অনেকক্ষণ পরামর্শ

করেছিলেন। ওঁরা ঠিক করলেন, যে, মেয়ের যখন কাউকে ভালো লেগেছে তখন তাকেই সমর্পণ করা সমীচীন। সমস্ত কথাটা ভোগরামকে জানাবে বলে ঠিক করে। সে শুনলে হয়তো কিছু বলবে না, বিয়েটা দিয়ে দেবে। তখন ওঁদের চিন্তাও দূর হবে। কিছু দিনের জন্য ওকে মামার বাড়ীতে পাঠাবে বলে ঠিক করলেন ওঁরা। মা বলেন—ওর মাথায় শনি চেপেছে। কিছুদিন ঘুরে এলে হয়তো ওর মনটা একটু ভালো লাগবে। সেখানে বেশীদিন থাকলে হয়তো ওর চিন্তা ওকে আর ব্যাকুল করে তুলবে না।

কিন্তু ভোগরামকে আর কথাটা বলা হল না। এই মাসে ব্যবসা-পত্রে তার অনেক লোকসান হয়েছে। ঘরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ গুমরে থাকে একটুতেই ওর রাগ হয়। তরিতরকারী রান্না ভাল না হলে ও থালা বাটী ছুড়ে দেয়। ছেলেমেয়েরা একটু চেঁচামিচি করলেই উগ্রমূর্তি ধারণ করে।

এদিকে বাসন্তীকে মামার বাড়ীতে পাঠাতে চায় বলে মা আর বৌদির উপর ওর ভীষণ রাগ হল। ওদের স্পষ্টভাবে বাসন্তী জানিয়ে দেয়ে যে সে যাবে না। তখন সুজলার ভীষণ রাগ হল বাসন্তীর উপর। পেটের মেয়ে হয়ে সে এত বড় বড় কথা শোনাতে পারছে। একটা সামান্য পরের ছেলের জন্য ও মাকেও অবজ্ঞা করার সাহস পেল কোথা থেকে ?

—বাসন্তী, যাবি কি যাবি না, ঠিক করে বল ?

—আমি কি তোমাদের কেনা গোলাম যে যেখানে পাঠাবে সেখানেই ছুটব ?

—অনেকদিন থেকেই মামী তোকে যেতে বলেছে সেজন্য বলছি।

—বুঝেছি, তোমরা আমাকে শেষ করে দিতে চাইছ, তাই।

—মুখ সামলে কথা বলবি। আইবুড়ো মেয়ে হয়ে এই ধরণের কথা বলতে তোর লজ্জা করে না ?

—যাব না বলেছি যাব না। আমার এক কথা। তোমাদের

কাছে যখন আমি এতই বোঝা, গলায় কলসী বেঁধে সোনাইতে ডুবে মরতে বল না কেন ?

—তুমি খারাপ পথে পা বাড়াচ্ছ, যা দেখছি।

মা আর তরুলতা তুদিন বাসন্তীর সঙ্গে কথা বলেননি। তৃতীয় দিন সুজলার মেয়ের প্রতি বড়ই মায়া হয়। শোবার সময় মেয়ের মাথায় হাত বোলান। বাসন্তীও মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। মা বলেন—ভাল কথা বললে শত্রু মনে করিস কেন ? আমার কি তোর প্রতি মায়াদয়া নেই ?

ও শান্ত শিশুর মত মায়ের কথা শুনতে মা ওকে সোনাইপারের জীবনধারা আর দর্শনের ইতিকথা বলে যান।

সেনাইপারের গ্রাম্যজীবন বিপদ-সংকুল। সোনাইকে ভরসা করেই এর চাষ-আবাদ। সোনাইর পলমে এর মাটি শস্যশ্যামল হয়েছে। কোন বছর হয়তো সোনাইপারের গ্রাম ধান, চাল, শাক-শব্জীতে উপচে পড়ে। পরের বছর হয়তো কোন ফসলই হল না। বন্যার করাল গ্রাসে শাকসব্জী, ধান, পাট নষ্ট হয়ে যায়। মারী মড়ক লাগে। আকাল হয়। এর সমগ্র জীবনযাত্রার গতি সোনাইর স্রোতই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রকৃতির ভীষণ বৈষম্য সোনাইর বুকের উপর দিয়ে গিয়ে সব কিছু ওলট-পালট করে দেয়। বর্ষাকালে জল জমে যায় পাঁচ ছয় হাত পর্যন্ত। কপাল মন্দ থাকলে যে কোন যায়গায় কেউটে সাপ ফণা তুলতে পারে। পাট কাটার সময় মছন্দরী বা বোয়াল মাছও গুঁতিয়ে দিতে পারে। তার উপর ঝড় বাতাস এসব তো আছেই। ঝড়ের দমকা হাওয়ায় ঘরের চাল উড়ে যায়। কার ভাগ্যে কখন কি আছে, বলা যায় না। আঞ্চলিক বিশ্বাস, সামাজিক নীতি-নিয়ম এবং কুসংস্কারেই ওদের জীবনের ছন্দ বজায় থাকে। প্রকৃতিকে তুষ্ট করার জন্য তারা পুজো করে, গাছের গোড়ায় সিঁদুর লেপে পুজো করে। কোন আঞ্চলিক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সামনে ছাগল, হাঁস, পায়রা বলি দেয়। মরাপুর, বংবরি, দরভিয়াল এবং মাজগাওঁ আদি গ্রামের নামঘরে হরিসভা হয়। মারী, মড়ক

হলে বা আকাল অনটনে, তারা নামঘরে পূজো দেয়, হার মানে না। কারণ সোনাই ছেড়ে এরা কোথাও যেতে পারবে না। বিপদের আশংকা নিয়ে বেঁচে থাকার আনন্দ সব আনন্দের চেয়েই শ্রেয় বলে মনে করে এরা। বিপদকে সাহসিকতার সঙ্গে তুচ্ছ মনে করাই সোনাই পারের লোকের স্বভাব।

কিন্তু সোনাইপারের পুরুষেরাই সব বিপদের সম্মুখীন হয়। মেয়েরা ধান কাটে, মাটিতে বীজ রোয়, ঘর-গেরস্থালীর কাজকর্ম করে। সোনাইপারের লোকেদের এইটেই বিশ্বাস যে পুরুষের দৈনন্দিন বিপদসংকুল জীবনে নিজের নিরাপদ অবস্থা নির্ভর করে বাড়ীর মেয়েদের উপর। তারা যদি শুচি মনে, পবিত্র মনে দিন কাটায়, পরকীয়া প্রেমে না মজে, অবৈধ প্রণয়ে না আসক্ত হয়, তাহলে মেয়েদের সতীত্বের জোরে পুরুষেরা বিপদ থেকে উদ্ধার পায়। এইটেই হচ্ছে বংশ পরম্পরায় ধরে চলে আসা সোনাইপারের জীবন-দর্শন।

তবুও লোকে প্রকৃত জীবন নিয়ম মানে না—মানে না প্রচলিত দর্শন বা সংস্কার। মাঝে মাঝে সোনাইপারে পরকীয়া প্রেম অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। বিহুগীতের আনন্দঘন সুরে, নেশার স্বরে চোখের বিলম্বিত ছন্দে সোনাইপারের ছেলেমেয়েও উদ্দাম নৃত্যে মেতে ওঠে। আর সুজলার মত অন্য অনেকে ভাবেন যে মেয়েদের পাপের জন্যই পুরুষের সর্বনাশ। রাত্রে শোবার সময় মেয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে মা বলেন—গন্ধ-কলাইয়ের বৌএর পাপের জন্যই সে বেচারা পাট ছাড়াতে গিয়ে নদীতে ডুবে মরে। সেদিন সোনাইতে ঝড় বাতাস ছিল না তার নৌকাটাও ছিল মজবুত।

বাসন্তী গন্ধকলাইয়ের বৌ চিত্রার কথা জানে। স্বামীর অবর্তমানে ওর কাছে স্বরূপ দোকানী আসত। স্বরূপ ওকে জরির বুটিদারের রিহা-মেখলা দেয়। ও চুলে যে গন্ধ তেল মাখে তাও স্বরূপের দেয়া উপহার।

বাসন্তী মায়ের কথা বিশ্বাস করে। ওর বুকের ভিতরটা হুহু করে ওঠে। মা আবার বলেন—জানকীদাকে দুপুরেই বনে বাঁশকাটতে

কেটী সাপে ছোবল দেয়। তক্ষুণি সে মারা যায়। অবশ্যি ওর স্ত্রী ভালো মেয়ে। সকলই অনর্থের মূল হচ্ছে জানকীর বোন। সেই অলক্ষ্মী। ওর জন্যই বাড়ীটা ধ্বংস হতে বসেছে। কারণ একমাত্র উপার্জনকারী দাদাও মারা যায়। এবারে ও নষ্ট করার কথা কে না জানে? মা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী চেঁচিয়ে ওঠে। ওর জন্যে যদি ভোগরামের কোন দুর্দশা ঘটে, তাহলে বাড়ীটা ছারখার হয়ে যাবে। বাবা মারা যাবার পর এই দশ বছর সেই বাড়ীটা চালিয়ে এসেছে। ওদের দুবেলা দুমুঠো খাওয়ানোর জন্য ও দিন রাত দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

বাসন্তীর আর্তনাদ শুনে মা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—মেয়েরাই ঘরের লক্ষ্মী। মেয়েদের ধর্মেই সংসারের মঙ্গল। এখনও সময় আছে মা। তুই তো এই সেদিনকার মেয়ে ধৈর্য ধরে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোর দৌলতেই আমরাও উদ্ধার পাব। তুই বুড়ো মায়ের এইটুকু কথাও রাখতে পারবিনে মা?

কথাগুলো বলতে বলতে সুজলার গলা কেঁপে ওঠে। বাসন্তীর হাতটা চেপে ধরলেন, তাতে তাঁর অনুরোধের তীব্রতা প্রকাশ পেল। লম্ফের আলোতে কোটরাগত চোখে দুফোঁটা জল। বাসন্তী মায়ের বুকে মাথা লুকিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছিল আর অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ধনঞ্জয়ের ছায়া মাড়াবে না। বিকেলে কোথা থেকে এসে ও যখন সাইকেলে তিনবার ঘণ্টা বাজাবে, বাসন্তী তখন কানে তুলো দিয়ে থাকবে। সে কখনও বাড়ীর মধ্যে চলে এলে বাসন্তী ঘাটে চলে যাবে। ওকে ঘাটের ওপারে দেখলে দৌড়ে বাড়ীতে চলে আসবে। এমনি করলে সে আশা ভরসা ছেড়ে দেবে। সে মুক্তি পাবে। ও শুচি হবে। যদি বরাত জোরে ওর সঙ্গে কখনও ওর বিয়ে হয়, তখনই ওকে আপন বলে ভেবে নেবে।

পরের দিন সকালেই ও মাকে জানায় যে ও দিন দুয়েকের জন্য কহিগুড়িতে মামার বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসবে। কথাটা শুনে তরুলতা আর মায়ের মনের বোঝা হাল্কা হল। দুদিন পরেই

বাসন্তী মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ী গেল। ও যাবার সময় ফিস্‌ফিস্‌ করে বৌদি বলে, আমি তা হলে দাদাকে বলে দেখব, অন্য কিছু বলব না, বলব ওর জন্য ধনঞ্জয় কেমন ?

কৃতজ্ঞতায় বাসন্তীর দুচোখ বেয়ে জল পড়ে। মায়ের চোখে পড়বে বলে, আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ফেলে।

ছয়

সুজলা অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী মহিলা। জীবন সম্পর্কে তাঁর যে নীতিবোধ ও অভিমত তা সময়ের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বাসন্তী তাই মায়ের উপর বেশী ভরসা রাখতে পারে না। যত ভরসা তরুলতার উপর। যেটুকু সহানুভূতি ও বৌদির কাছ থেকে পেয়েছে, সেটুকুই ওর মস্ত বড় সান্ত্বনা। মেয়েদের মন চঞ্চল হলে যে তা সংসারের পক্ষে অমঙ্গল, পুরুষের বিপদ ডেকে আনে—সোনাইপারের এরকম ধারা দৃষ্টিভঙ্গিতে ও জীবন্ত জ্বলে পুড়ে মরছে। তবুও আশা—যে ওর বৌদি হয়তো ভোগরামকে প্রস্তাবটা দেবে, আর ভোগরামও পছন্দ করবে হয়তো ধনঞ্জয়কে, সামাজিক নিয়মেই ওদের বিয়েটা সমাধা হয়ে যাবে হয়তো। কিন্তু গত চার মাস থেকেই—বাসন্তীর সঙ্গে ধনঞ্জয়ের মনের যোগাযোগ হওয়ার মাসখানেক আগে থেকেই—ভোগরাম এমন একটা সঙ্কটে পড়েছে যে তার থেকে উদ্ধার হওয়া তো দূরের কথা, তার ভবিষ্যতটাও অন্ধকার হয়ে গেছে। তার ভবিষ্যৎ মানেই সাতটা প্রাণীকে নিয়ে একটি পরিবারের ভবিষ্যৎ। আজকাল সোনাইপারের জীবনে পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক জীবনে নতুন মূল্যবোধ প্রবর্তিত হয়েছে। কৃষিজীবন অব্যাহত থাকলেও লোকে নানা নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছে। ফলে অভাব বাড়ছে। লোকে আজকাল স্বার্থপর হয়েছে—ম্লান

হয়েছে সেদিনের মানবতাবোধ। সোনাইপারের লোকেদের আজকাল আর বনগীতের কোমল করুণ মূর্ছনা, বড়গীতের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আর প্রকৃতির অকৃপণ অবদান সুখী করতে পারে না। জীবনের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক তাৎপর্য বুঝতে পারে না অনেকে। নতুন পরিস্থিতিতে অনেকে দক্ষ ও সুচতুর হয়েছে। পুরানো বনেদী পরিবারের হয়তো অবস্থা পড়ে গেছে অপর নতুন কিছু পরিবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

সোনাইপারের গ্রামগুলোতে জনসংখ্যা বেড়ছেই ক্রমশ। চাষের মাটিতে কুলোচ্ছে না। কোন পরিবারে হয়তো পনের বিশ একর মাটি পুরুষানুক্রমে ভাগ হয়ে হয়ে দুই চার একরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া ইংরেজ আমল থেকে দলে দলে শোষকের দল কৌশল খাটিয়ে শুষছে সবাইকে। সোনাইপারের প্রশস্ত রাস্তাগুলোতে পাথরের নুড়ি ছড়িয়ে পাকা রাস্তার কাজ চলছে। সরকারী সাদা বাড়ী ঝক্‌ঝক্‌ করছে কয়েকটা জায়গাতে। প্রতি গ্রামে তিন চারটে করে ঠিকাদার, রোড কন্ট্রাক্টর, তাদের দলবল নিয়ে জায়গাটা বেশ জমজমাট করে তুলেছে। এত সব শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও সাধারণের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপের দিকে। গরীব জনসাধারণেরা ক্রমে আরও গরীব হয়ে যাচ্ছে। নতুন পরিস্থিতিতে সোনাইপারের সরল, সহজ লোক আরও নিষ্ঠুর অসৎ ও চতুর হয়ে পড়েছে। শিক্ষার প্রসারের অভাবে মানুষের মনে নতুন নীতিবোধের উন্মেষ হয়নি। সোনাইপারের লোকেরা এখন আর উদার চিত্তে জীবনকে মাপতে ভুলে গেছে।

নতুন এই পরিস্থিতেতে ভোগরাম খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করছে নিজেকে। কিন্তু দিন দিন সে উপায়হীন। ভোগরামের বাবা ছেলের জন্য বেশী জমি-জমা রেখে যাননি। মাত্র কয়েক বিঘে জমি রেখে গেছেন তিনি। তার জন্য সে ভুলেও বাবাকে দোষ দেয় না। তাঁদের সময় জমির দাম ছিল না। সোনাইপারে জিনিষপত্রের প্রাচুর্য ছিল। প্রাচুর্য মানুষের দূরদর্শিতা কমিয়ে দিয়েছিল, তাই ছেলের জন্য অনেকটা জমি-জমা রেখে যাওয়াটা উনি প্রয়োজনীয়

মনে করেন নি। তাঁর সময় চাষীর জীবন ছিল স্থাবর অথচ সচ্ছল। তখন লোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বৈষয়িক উন্নতির মোহ ছিল কম আর সেটাই স্বাভাবিক। তখন লোকে পরজন্মের সদ্গতির বিষয়ে ভাবত। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা লোককে কর্মবিমুখ করেছিল।

মৃত্যুর আগেই শুধু ভোগরামের বাবা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর রেখে যাওয়া কয়েক বিঘা মাটির দ্বারাই ছেলে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে পারবে না। তাঁর জীবদ্দশাতেই ভোগরাম চাষের কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং পরে ব্যবসা শুরু করে।

ভোগরামের কারবারটা অদ্ভুত ধরণের। মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে ধান, মাসকলাই, সরষে ইত্যাদি কিনে এনে সপ্তাহান্তে এক গাড়ী দু গাড়ী মাল চড়া দামে বিক্রী করে। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত সে ফুলগুরি, জাঁজরি আর দলংঘাটের বাজারে কাটা কাপড় বিক্রী করে। বাকী চার মাস পাটের ব্যবসা। দুতিন দিন ঘুরে দশ বারো মণ পাট সংগ্রহ করে একদিন শহরে গিয়ে পাট ব্যবসায়ীকে বেচে আসে। এই রকম কারবারে নামাটা খুব সাহসের ব্যাপার। পাটের ব্যবসা মানে জুয়োর ব্যবসা। একগাড়ী পাট একশো টাকাও লাভ হতে পারে আর বরাত খারাপ হলে মূলধনও চলে যেতে পারে। পাটের 'বাজার দর' বোঝা আর সুন্দরী মেয়ের মন বোঝা একই কথা। তবুও ভোগরামের বড় একটা লোকসান হয় না। সে কারবারে নেমে কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ওর সম্বল হ'ল—গরুরগাড়ী একটা, বলদ এক জোড়া, দাঁড়িপাল্লা আর পাট মাপবার কাঁটা। দু তিনশ টাকা পর্যন্ত মূলধন খাটায়। এতেই সংসার চালাচ্ছে সে আর বোন রূপন্তীর কহিগুড়িতে বিয়ে দিয়েছে আর নিজেও বিয়ে করেছে। আটচল্লিশ সালে পাটের খুব দর উঠেছিল। সেবছরই সে বেশ কিছু টাকা লাভ করেছিল। ভাল করে বাড়ী ঘর মেরামত করে একজনকে গাড়োয়ান রেখেছিল। সাইকেল কিনেছিল। হাঁটু অবধি পরা ধুতি পায়ের কন্মুই পর্যন্ত নেমেছিল। সে এখন ভদ্রলোক, পকেটে ফাউন্টেনপেন গুঁজে ঘুরে বেড়ায়। লাল

কাপড়ে বাঁধানো ছুভাঁজ করা দড়িতে বাঁধা লম্বা খাতাতে ওর হিসেব-পত্র রাখতে শুরু করে। এখন ভাতের সঙ্গে আচার খেতে শিখেছে। চায়ের সঙ্গে গাওয়া ঘি দিয়ে ভাজা লুচিও খেতে আরম্ভ করেছে। ভোগরাম কলিতা এখন ভোগরাম মহাজন।

আটচল্লিশের মত লাভ না হলেও কয়েক বছর তার ব্যবসা ভালই চলে। মুলধনও বাড়ে কিছুটা। সে বড়লোক না হ'লেও ওদের মরাপুর গ্রামের গোপাল মণ্ডল, কেরপাই মহরী, যোগেশ রায়ন ও জয়রাম পণ্ডিতের চেয়ে ওর অবস্থা ভালই। কিন্তু গত দু বছর থেকেই ওর যেন গেরো লেগেছে, কিছুতেই কুল পায় না। বর্ষায় কয়েক গাড়ী পাট বেচেছিল কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি। কারণ তারপর থেকে পাটের দর আর ওঠা-নামা করে নি। ধান সরষের কারবারও খুবই মন্দা। সেজন্যই ও কারবার নিয়ে তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ব্যবসার লাভেই সংসারের খরচ চালাতে হয় বলে ও নানা টুকি-টাকি কারবার করে সংসার চালাচ্ছে। জামা-কাপড় বিক্রীর কারবার না করলে তো সংসারের খরচই চলত না। শেষকালে গাড়োয়ানটাকে ছাড়িয়ে দিতে হ'ল। কারণ গরু-গাড়ী বছরে দু মাস চলে। তাও পাট ব্যবসার সময়ে। ঐ দু মাস ভাড়া করা লোক একজনে গাড়ী চালায়।

পাঁচ ছয় বছর ধরেই ভোগরাম লক্ষ্য করে এসেছে যে সোনাই-পারের লোকেরা আর আগের মত ধান বিক্রী করতে পারছে না। সরষে ক্ষেতেও আজ ধান হচ্ছে, সেই মাটিতে আবার তরি-তরকারীও হচ্ছে, এক বছর ছেড়ে সরষে বোনা হয় জমিতে। তবুও লোকে ধান সরষে বেচতে পারছে না। সপ্তাহ দুই ঘুরলে তবে কোন রকমে এক গাড়ী যোগোড় করা যায়, কিন্তু এই ভাবে তো আর ব্যবসা চলে না। সেজন্য এই কারবার ছেড়েই দেয় ভোগরাম।

দেশে খাবার লোক অনেক বেড়ে গেছে। চাষের ক্ষেতে আর ফসল ভরে ওঠে না। মাটিতে কি সার নেই না কি? ভোগরাম মনে করে, পাটের ফসল কিন্তু আগের মতই হচ্ছে। একই জমিতে পাটের

চাষ করলে দু বার ফসল ওঠানো যায়। কারণ পাট কাটার পর জল কমে গেলে খালি ধান রোয়া যায়। এই অঞ্চলে পাটের চাষ যারা করে তাদের অবস্থা খুব খারাপ। এক সময়ে কিন্তু সোনাইপারের লোকেরা পাটের মূল্য বুঝত না। গরু বাঁধবার দড়ির প্রয়োজনীয়তার জন্য পাটের চাষ করা হ'ত। প্রথম যেবার যুদ্ধ লাগল সেবার থেকেই ওই চাষে মানুষ মন দেয়।

ভোগরামের অবস্থা ক্রমশই খরোপের দিকে যেতে থাকলেও সে একটা কথাতেই আশ্বাস পেয়েছে। ধানের ব্যবসায়টা ভাল হয়নি, পাট বোনা মাটিতে ধান রোয়ার জন্যই হয়তো। সোনাইর পারে যতদিন পাটের ফসল থাকবে, ততদিন ওর কারবার চালু থাকবে। তার উপর পাট বেচে লোকে টাকা পেলে অন্য খরচ করতেও পারবে। কাজেই ওর জামা কাপড়ের কারবারটাও চলবে।

কিন্তু এই দুটো মাস সে বড়ই হতাশ হয়েছে। বেবেজিয়ার থেকে হাতীচুণ্ড অবধি রাস্তাটাতে পাথর ছড়ানো হয়েছে। রাস্তাটাও ভেঙে বড় করা হচ্ছে। এই রাস্তাটাই যেন এগিয়ে এসে সোনাইর পারের চারটে গ্রাম স্পর্শ করবে। গত বর্ষায় এক হাঁটু কাদায় ঢুকে যাওয়া রাস্তাটাতে নুড়ি পাথর ছড়িয়েছে বলে ভালই হয়েছে লোকেদের পক্ষে। আজকাল এই রাস্তা দিয়ে শহর পর্যন্ত পাটের গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে খুবই সুবিধে হবে। পরে কি সুবিধে হবে বলা যায় না, এখন কিন্তু ভোগরামের খুবই লোকসান হচ্ছে। রাস্তার পাথর ছুঁচালো। জেলাতে যেতে হলে হাতীচুণ্ডের থেকে বেবেজিয়া অবধি সদর রাস্তাটা ওই ছুঁচলো নুড়িতে ভরা,—ওর উপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে নিয়ে যেতে বড়ই কষ্ট হয়। দেড় মাসের মধ্যেই ভোগরামের দুটো টায়ার বদলাতে হয়। টায়ারের যা আগুন দাম। একটা টায়ারই দশ টাকা। ছোটখাটো দোকানে দশ টাকা পঞ্চাশ নয়া। দেড় মাসেতেই যদি সাইকেলের পিছনে বিশ-পঁচিশ টাকা খরচ হয়, তা হলে কারবার চলবে কি করে?

এই দু বছরে ধরে ভোগরাম ওর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধও করতে

পারেনি। লোককে ডেকে খাওয়াতে পারছে না। এবার নিয়ে তিনবার সে স্বপ্ন দেখেছে বাবাকে। সে বুঝতে পেরেছে, যে শ্রাদ্ধে কেবল পুঁথির সামনে মাসকলাই ও চালের নৈবেদ্য দেওয়াতে বাবার আত্মা সন্তুষ্ট হননি। সেজন্য মোলাই মহরীর কাছ থেকে এক কুড়ি পাঁচ টাকা ধার নিয়ে জ্যৈষ্ঠ মাসের আঠাশ তারিখে কোন-রকমে বাবার শ্রাদ্ধে ভোজ দিয়ে লোক খাইয়েছিল। আজ দু মাস হয়ে গেল—এখনও মহরীকে টাকা শোধ করতে পারেনি সে।

মায়ের সঙ্গে বাসন্তী মামার বাড়ী চলে যাওয়ার পর দিনই মহরী বাসিমুখে টাকা ফেরৎ চাইতে আসে। মহরী গরম গরম কথাও শোনাল। এমন অপমান ভোগরাম জীবনেও সহ্য করেনি। যে মোলাই মহরী একদিন ওদের বাড়ীতে দুধ বিক্রি করত আর বাগানে কাজ করত সেই মোলাই মহরীর বড় বড় কথা শোনার আগে ও কালা হয়ে গেল না কেন? ভোগরামের সারা শরীর যেন রি রি করতে থাকে। সে অনেক ধৈর্য ধরে সব কথা সহ্য করে গেল। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল দু দিনের মধ্যেই টাকা শোধ করে দেবে।

সাইকেলটা খারাপ হয়ে আছে বলে দু সপ্তাহ ও ফুলগুরির হাটে যায়নি। পরের দিন শনিবারে ও সাইকেলে কাপড় বোঝাই পোটলা নিয়ে ফুলিগুরি হাটে গেল। হাটে গিয়ে সে অবাক হ'ল। জামা কাপড়ের দোকানই দশ বারোটা। হরেক রকমের কাপড়ে সেগুলো জম্‌জম্ করছে। ব্যবসায়ীরা শহরের। ধান-পাটের কারবারী গেরুয়া কেঞাও ফুলগুরি হাটে ওই ব্যবসাতে লেগেছে। সে বেশ একটা বড়সড় রকমের দোকান দিয়েছে। এই দোকানগুলোতে নানা রঙের ও নানা ধরনের কাপড় পাওয়া যাচ্ছে, তাই গ্রামের লোকের ভীড়। তাছাড়া শহরের এই লোকগুলোর ব্যবসায়ের কত ফন্দি। ক্রেতাকে আদর করে ডেকে বসিয়ে নিয়ে বিড়ি সিগারেটও দেয়। তাই সামান্য কাপড়ের কারবারী ভোগরামের দিকে লক্ষ্য নেই কারুরই। সে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে। দশটা অবধিও ওর বিক্রী হওয়ার কোনই আশা নেই।

মনের দুঃখে সে কাপড় জামা উঠিয়ে ফেলে। তার মনে প্রশ্ন অনেক। দিন দিন গ্রামগুলোতে কলে তৈরী কাপড়ের বিক্রী বেড়েই যাচ্ছে। মেয়েরাও আজকাল কলে সেলাই পাতলা চাদর পরেছে। হঠাৎ এই বিলাসিতা কোথা থেকে এল। না, লোকের অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল হয়নি, এ একটা হঠাৎ-আসা ফ্যাশানের ঢেউ। কিন্তু এটা তো গান্ধীর দেশ! আন্দোলনের সময় দেশের লোককে নেতারা বলেছিলেন ঘরে তাঁত চালান, মানে বিলাতী মেশিন বন্ধ করা। নিজের কাপড় নিজে বুনে নেওয়া মানে স্বাবলম্বী হওয়া। তাঁতের উপরেই দেশের উন্নতি নির্ভর করছে। সারা জীবন গান্ধীজী এই কথা বলে এসেছেন এবং নিজে চরকায় সূতো কেটেছেন। এখন গান্ধীজী নেই বলেই চরকার আদর নেই। যেসব নেতা আগে এই সমস্ত বক্তৃতা দিতেন, তাঁরা কি সবাই মত বদলে ফেল্লেন এখন? সূতো কাটতে সবাই অলস হয়ে গেল না কি? গ্রামের মেয়েদের হল কি?

হাট থেকে হতাশ হয়ে ঘরে ফেরে ভোগরাম। ভাবে গ্রামের লোকগুলো যদি স্বরাজের আগের দিনের মত সূতো কাটতো, তাহলে ওই ব্যবসায়ীরা এত সুযোগ পেত না: আর সেও আজ এত শোচনীয়ভাবে হার মানত না ওদের কাছে। লোকেদের বেশভূষা যদি আগের মতই থাকত, সেও তা হলে দু পয়সা রোজগার করতে পারত।

হাট পার হয়ে সদর রাস্তায় আসতেই হাটের মহাজন তিলকের সঙ্গে দেখা হয়। এই হাটটা তিলক এবারে বছরে বিশ হাজার টাকায় লীজ নিয়েছে।

কি মহাজন এখনই ফিরে যাচ্ছ?

—আর বল না, বিক্রীবাটা নেই। সিলেটের ব্যবসায়ীগুলো এসে আমাদের মাথায় লাঠি ভাঙছে। ওদের সঙ্গে কিছুতেই তাল দেওয়া যায় না।

—আচ্ছা ওরা দলে দলে কোথা থেকে আসছে?

—ওঃ তুমিও দেখছি অনেক কথাই জান না। দিন আষ্টেক হল ওই দিক দিয়ে তিনবার সার্ভিস বাস চলে। এখন তা ভূরবন্ধা অবধি যাবে। একখানা যায় মায়ঙ পর্যন্ত আরেকটা রহা অবধি। বাস চলার পর থেকেই এরা আসতে শুরু করেছে আর হাটটাও আগের চেয়ে বড় হয়েছে।

তিলকের কথায় ভোগরাম কোন উত্তর দিল না। সে শুধু এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আজ থেকে আর তার ফুলগুরি হাটে আসার প্রয়োজন নেই। সে জাঁজরি আর দলংঘাটের হাটেই কেবল দোকান দিতে পারবে। হে ভগবান যেন ওই দুটো হাটে অন্তত সিলেটী ব্যবসায়ীরা না আসে।

দুপুরে ভাত খাওয়ার পর ওর স্ত্রী বাসন্তীর তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার কথা বলে। সে গম্ভীর হয়ে বলে—তোমাদের মেয়েদের অন্য কোন চিন্তা নেই, কেবল বিয়ে, বিয়ে আর বিয়ে। এতই যদি ছেলের আকাল তো ঐ হাত দেখা বাবাজীকেই দিয়ে দাও, মেয়েদের ধৈর্য বলে কোন জিনিষ নেই।

—এত রাগ করছ কেন? আমি এমনই কি অসম্ভব কথা বলেছি? মেয়েরা কেন, তোমাদের মত অনেক ছেলেও বলবে যুবতী মেয়ে আর বনের বাঘ একই!

—আর আমিও সেই বাঘের মুখে লাগাম লাগাতে জানি। ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও। আর মাস দুয়েক পরে বাসন্তীর বিয়ে দেওয়া দূরে থাক খাওয়াপরা চালাতে পারব কি না তাই সন্দেহ।

—তুমি কি আজেবাজে বকছ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ভোগরাম তখন ওর ফুলগুরি হাটের দুর্দশার কথা বলে। তরুলতা হতাশ হয়। সে ভাবল, বাসন্তীর সেই গোপন কথাটা এই সময় ভোগরামকে বলা উচিত হবে না। সে হয়তো রেগেমেগে উঠবে। হিতে বিপরীত হবে।

সেই রাত্রে নানা দুশ্চিন্তায় আর আশঙ্কায় ভোগরামের ঘুম হল না। দু মাসের মধ্যেই গড়কাপ্তানী বিভাগের রাস্তাটা বেবেজিয়ার থেকে

জামরি অবধি পৌঁছেচে। দেশের রাস্তাঘাট ভাল হলে সাধারণ লোকের মঙ্গল এবং কাগজেও তা লেখে। কিন্তু আজকেই সে বুঝতে পারে, ওই নতুন রাস্তাটা কালসাপ হয়ে ওকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে। লেম্‌লেমির কাঠের সেতুটা যদি নিমেষের মধ্যেই ও পুড়ে ছাই করে দিতে পারতো? বেজরচুকের বাঁশের সেতুটা ভেঙে এখন কাঠের সেতু নির্মিত হয়েছে। সব সেতুগুলোই এখন কাঠের হয়ে গেল। কাঠের সেতু হ'লে সোনাই-এর পার অবধি মোটর চলবে। মোটর কথাটা শুনলেই ওর বুক কেঁপে ওঠে। মোটর চলার দরুণই ফুলগুরি হাট থেকে চিরকালের জন্য ওকে বিদায় নিতে হ'ল।

সেদিন থেকেই ভোগরাম দলংঘাট আর জঁামরির হাটে যাতায়াত স্নুরু করল। আর সব কারবার টুক্‌টাক চল্লেও আগেকার মত আর তার উৎসাহ নেই। নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে সে। সামান্য কথাতেই রাগ হয়। তরুলতা অনেকবার চেষ্টা করেও বাসন্তীর কথাটা ওর সামনে পাড়তে পারেনি।

একদিন বাসন্তী আর মা কহিগুড়ি থেকে ফিরে আসে। ভোগরাম ওর মামাদের কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করল না। ওর মাত্র একটা চিন্তা। ওর অনেক টাকা চাই। না হলে ব্যবসা করাই বৃথা। কিন্তু মূলধন যোগাড় হবে কেমন করে? এই তিনমাস সংসার খরচ লাভের টাকায় চলেনি। ব্যবসায়ে খাটানো টাকার অঙ্ক কমে আসছে দিন দিন।

সাত

বর্ষা এল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। নদী নালা উপচে পড়ে। সোনাই নদী কানায় কানায় ভরে উঠেছে। খেত-খামার সবুজ লক্ষ্মীতে ভরপুর। শরালী, বুনো হাঁস ও কাম পাখীর বর্ণ-

বৈচিত্র্যে দিগন্ত প্রসারিত ক্ষেতের নীরব গাম্ভীর্য ভেঙে দেয়। বুনো পাখীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ে মাটি আর মেঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাচ্ছে। গাঙচিলা, জলমৈ গ্রাম, আর মরাপুরের বন-ময়ূরের দল মেঘের গর্জনে আত্মহারা হয়ে নাচতে থাকে। ডাউক আর মাছরাঙ্গার চীৎকার মনে করিয়ে দেয়, সোনাইর উজল জলরাশিতে সোনালী রূপালী ও মেঘালী মাছের খেলা। বাও ধানের মাঝে মাঝে যে সরু সিঁথির মত রাস্তা গেছে, সেখান দিয়ে ডানা মেলে আনাগোনা করছে কাম পাখী।

ফুলের গাছে কুঁড়ি ফোটে। কাশ বনও সবুজ তরঙ্গে প্রাণচঞ্চল। খাল বিল জলে ভরে উঠেছে। দাতুরীর প্রাণখোলা চীৎকারে সোনাইর ক্লান্তিহীন স্রোতে গতিবেগ বাড়ে। সোনাইপারের গ্রামগুলো প্রকৃতির নতুন রূপে মহিমান্বিত! বর্ষার উদ্ভ্রান্ত অসংযত প্রাণময় বৈষম্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শিখল লোকেরা। মাছ ধরার নেশা পেয়ে বসল সবাইকে। সোনাইর জলে দুঃসাহসিকভাবে নৌকা চালিয়ে তারা বেঁচে থাকে। এইটেই পাট কাটা, পাট ছাড়ানো ও পাট গোটানোর সময়। এই সময়টাতেই পাট বিক্রী করে সারা বছরের টাকা সঞ্চয় করে রাখার সময়।

মাঠে ঘাটে ভেজা পাটের গন্ধ চাষীদের মনে অর্থ প্রাপ্তির আশা সঞ্চার করে। দালান-চত্বরে বাঁশের দাঁড়ে গাঁয়ের বৌ ঝিয়েরা পাট শুকোতে দিয়ে শারদ পূর্ণিমার স্বপ্ন দেখে। সোনাইপারের জীবনের ছন্দে বনগীত হয়ে মিশে যায় সেই স্বপ্ন।

শ্রাবণের অশান্ত আকাশে বিদ্যুতের ছায়ামায়া চমক, প্রবল বারিবর্ষণে ব্রহ্মপুত্রের জল ফুলে ওঠে, শাখা নদীগুলোও ভরে ওঠে— ভরে ওঠে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা, শুধু ভোগরামের মনেরই কোন পরিবর্তন হয় না। নদীর জল বাড়বার সঙ্গে পাটের দাম বাড়লেও ব্যবসায়ে তার লাভ হয় না। নিজেই নৌকা বেয়ে বেয়ে সোনাই নদীর এপার ওপার করল ভোগরাম। হাড়কে মাটি করে, রক্ত জল করে ভোগরাম বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়িয়েছে পাটের আশায়, কিন্তু

দশদিনের মধ্যেও সে লাভ করতে পারে এমন দামে পাট পেল না কিনতে। লোকগুলো এখন সেয়ানা হয়েছে। দর দামের বেশ খবর রাখে আজকাল। কাঁটাটা হুমড়ে দিয়ে এদিক ওদিক করে ওজন করে লাভ করত সে আগে। এখন লোকে এই সমস্ত কায়দা-কানুন ধরতে পারে। কিন্তু এক বছরের মধ্যে লোকেরা এত চালাক হয়ে গেল কি করে? ওর মতই ব্যবসায়ী চাকিরাম। সে বলে পাট কাটার আগে সোনাইপারের গ্রামে অনেকগুলো মাড়োয়ারী এসেছিল। ওরা গ্রামবাসীদের বায়না দিয়ে গিয়েছিল আর বলেছিল যে পাট সব সময় পদ্ম-কাঁটায় মেপে নিতে হয়। পকেটে যে সব কাঁটা নিয়ে বেড়ায় সেগুলো ঠিক নয়। শহরের ব্যবসায়ীরা আসতে পারে শুধু এই কারণেই সে পাকা রাস্তাটা সোনাইর দক্ষিণ পারের গ্রামগুলিতে এসে পৌঁছেছে। সাধারণ ব্যবসায়ীর জন্য এই রাস্তাটা সর্বনাশের কারণ ঘটায়।

লোককুমমি সেতু আর হাতীচুঙ-জাজরির মাঝের সেতুটা চৈত্র বৈশাখেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল। শ্রাবণ মাসে ইঞ্জিনীয়ার এসে পরীক্ষা করে কত ওজনের যান-বাহন এই সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে তার হিসেব নিকেশ করেন। সেতুর সামনে সাইন বোর্ড লাগানো হল—তাতে লেখা—'ম্যাক্সিমাম টনেজ'। বেবেজিয়ার থেকে দলংঘাট পর্য্যন্ত এই নতুন রাস্তার উপর দিয়ে ট্রাক, বাস, আদি যাতয়াত করতে পারে বলে সরকার অনুমতি দেয়। তার ফলে ভোগরাম আর তার মত অনেকেই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

দলংঘাট সোনাই নদীরই একটি ঘাট। ভোগরামের গ্রাম মরাপুর থেকে হয়তো মাইলখানেক পশ্চিম দিকে হবে। সোনাই করে নৌকা দিয়ে এলে হয়তো তার চেয়ে দুই ফার্লং কম হ'তে পারে। গরমের সময়ে এই ঘাটে প্রতি বছরই এক একটা করে বাঁশের সেতু তৈরী করা হয় বলেই ঘাটের নাম দলংঘাট বা সেতুঘাট হয়েছে অনেক দিন থেকেই। এই কথার ইতি বৃত্তান্ত সোনাইপারের লোকেরা ঠিক জানে না। দলংঘাটের দক্ষিণে মণিপুর-বরি নামে

গোচারণ ভূমি সংলগ্ন। সেখানে ঘাটের কাছেই দলংঘাটের বাজার বসে। এই বাজারটাই হচ্ছে উত্তরপার ও দক্ষিণপারের লোকেদের সংযোগস্থল। এখানেই ভোগরামের জামা কাপড়ের ব্যবসায় খুব ভাল চলে। বর্ষায় সোনাই পারের দূর গ্রামের লোক নৌকা করে এখানে পাট নিয়ে আসে। এখান থেকেই ভোগরাম পাট কিনে নিয়ে গিয়ে পরে তা শহরে বিক্রী করে কয়েক বছর ধরে লাভ করে এসেছে। কিন্তু এবার বর্ষায় তার কপাল মন্দ। দলংঘাট বাজারে অনেক পাটের আমদানী। কিন্তু দাম অনেক বেশী আর এই দামে কিনলে লাভ হয় না।

পাকা রাস্তাটা সোনাইর পার পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার সপ্তাহ দুই পরে ভোগরাম এমন সঙ্কট আর হতাশার সম্মুখীন হল যে তার নিজের অস্তিত্বটুকু অনুভব করার মত মানসিক শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে। বাজারের দিন খালি গরুর গাড়ীর পিছন পিছন সাইকেল টেনে নিয়ে আসছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দলংঘাট বাজার থেকে পাট কেনা। কিন্তু রাস্তায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাক যাতায়াত করছিল, তার মাঝে গরুরগাড়ী দেখাই যাচ্ছিল না। বাজারে পৌঁছে দেখে পাটের ব্যবসায়ে লিপ্ত ধনী মাড়োয়ারীরা এসেছে বাজারে। বড় *খুঁটি পুতে প্রকাণ্ড বড় 'পদ্ম কাঁটা' টানিয়ে পাট ওজন করে চলেছে* অবিরত। কিছুক্ষণের মধ্যে পর্বত প্রমাণ পাটের ট্রাক বোঝাই করে শহরে যাচ্ছে। কোথায়ও সে এক মন পাট কিনতে পারল না। মনের দুঃখে সে কাঁটাটা পকেটে লুকিয়ে রাখে। লোকেরা ওকে আর পাট বিক্রী করতে চায় না। যেসব মহাজনকে পাট বিক্রী করে লাভ করে সেই সব মহাজন এখন চাষীদের কাছ থেকে সোজা পাট কিনে নিচ্ছে। চির পরিচিত দলংঘাট বাজারে পরিচিত ক্রেতা-বিক্রেতাদের সামনে মুখ দেখাতে সে লজ্জাও অপমান বোধ করছে। দশটা না বাজতেই সে বাজার থেকে চলে আসে। বাড়ী ফিরে সোজা সে ঠাকুয়া ঘাটে চলে যায়, আর সেখানে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ একলা বসে থাকে। সে একা একা সোনাইর সামনে কাঁদে।

আজ তার জীবনে মস্ত বড় পরাজয়। এই পরাজয়ই ওকে একদিন নিশ্চিহ্ন করে দেবে। দারিদ্র্য ওর জীবনে সকল আশা ভরসা, সুখ-সম্পদ কেড়ে নেবে। দারিদ্র্যকে ও ঘৃণা করে অন্তর থেকেই।

দিন দুয়েক ও ঘরেই ছিল। বাড়ীতে কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। কেউ তার সঙ্গে সাহসও পায়নি কথা বলার। এই নতুন সংকট থেকে উদ্ধার হওয়ার কোন রাস্তা খুঁজে পায়নি ও। সোনাই-পারের সম্পদ ও প্রাকৃতিক মাধুর্য ওর উপর যেন ভীষণ প্রতিশোধ নেয়।

তবুও সে পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে রাজী নয়। পকেটে কাঁটা নিয়ে কয়েকটা গ্রামে ঘোরে। কিন্তু চার পাঁচদিন ঘুরেও এক গাড়ী পাট যোগাড় করতে পারেনি ও। ইতিমধ্যে ক্রেতাদের মতিগতিও বদলে গেছে। বেশীর ভাগ লোকই দলংঘাট বাজারে ব্যবসায় করে বেশী টাকার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বাজারে নিয়ে গিয়েই যদি শহরে বিক্রী করার দাম পায়, তাহলে স্থানীয় ব্যবসায়ীকে বিক্রী করার কি দরকার? তাছাড়াও দলংঘাট টাউন থেকে যে কয়েকজন মহাজন আসে, তারাই তো এই পাটের বাজার দর ওঠা-নামা করানোর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ওরা যেসব পাট কেনে সেগুলো সোজা কলকাতার মিলে চালান যায়।

ভাদ্র শেষ না হ'তেই ভোগরাম একেবারে ভেঙে পড়ে। ব্যবসায়ের আসল সময়েই ওর চরম বিপর্যয় হয়। চার মাসের ভেতরেই সে ফুলগুরি হাটে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। সোনাইপারের গ্রামে পাট কেনা শেষ হয়ে যায়। দলংঘাট বাজারে গিয়ে পাটের দাম জিজ্ঞেস করতেই ওর ভয় লেগে যায়। অনেক ভেবে চিন্তে সে উপায় খুঁজে পায়—জাজরি আর দলংঘাট বাজারে সে কাপড় বিক্রী করেই পরিবারের সংস্থান করতে পারবে। কারণ তখনও টাউন থেকে সোনাই অবধি সার্ভিস বাস চলেনি বলে টাউনের ঢাকাইপট্টির কারবারীরা এই দুটো হাটে আসেনি।

আট

নানা ছোটখাটো ঘটনা ও আশা-নিরাশার মধ্যে দিয়েই দিনগুলো এগিয়ে যায়। বাসন্তীর এই কয়েক মাসের আচরণে সুজলা ও তরুলতা মুগ্ধ হয়। বাসন্তী আজকাল বেশীর ভাগ ঘরেই থাকে। ঠান্নুয়া ঘাটে গেলেও থাকে না বেশীক্ষণ। প্রতিদিন মাকে পুঁথি পড়ে শোনায়। ওর মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যেই চেপে থাকে। আগের চেয়ে কাজে বেশী মনোযোগ দেয় বাসন্তী—তাঁত বোনে মনোযোগ সহকারে। প্রেমের পরশ অসীম ধৈর্য এনে দেয় গ্রাম্য এই মেয়েটিকে। আজকাল আর ধনঞ্জয়ের স্মৃতি ওর মনকে উতলা করে তোলে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ওর সঙ্গে বিয়ে না হয় ততক্ষণ আর ওর কথা ভাবার কোন অধিকার নেই বাসন্তীর। লখিন্দরের লৌহবাসরের চোখে দেখতে না পাওয়া ছিদ্র দিয়ে পাপরূপী সাপকে ঢুকতে না দেওয়ার চেষ্টা চলে, এই পাপ সোনাই-পারের ধারণার পাপ। হোমের অগ্নিকে সাক্ষী করে মন্ত্র উচ্চারণ করার পরে সোনাইপারের নব যুবতীরা মনের কামনা বাসনাকে আশ্রয় দিতে পারে, তখনই তারা দেহের চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিতে সক্ষম। এইটেই সোনাইপারের প্রচলিত নীতি বোধ। বাসন্তী ওর যৌবনে ভরা উচ্ছল মনটাকে সংযত করে ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্ন দেখে। আজকাল আর ও ঠান্নুয়া ঘাটে ধনঞ্জয়কে দেখতে পায় না। ধনঞ্জয় নাকি আজকাল মরাপুর দিয়ে শহরে যায় না।

মায়ের জন্য বাসন্তীর বড়ই দুশ্চিন্তা। চোখের ছানি কাটানোর পরই চশমা পরে তিনি কিছুদিন বেশ ভাল ফল পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন আবার সেই আগের মতই দেখতে পান না। চশমা জোড়া না কি কোন কাজেই লাগছেনা এখন। মার এরকম ভাবে হাতড়ে হাতড়ে ঘুরে বেড়ানটা ওর একেবারেই সহ্য হচ্ছে না। কিন্তু এমন সময়

চিকিৎসা করারও উপায় নেই। বাড়ীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হয়ে গেছে। তবুও একদিন দাদাকে বলে দেখে। কহিগুড়িতে থাকতেই ও শুনেছিল যে কাঁচের মাঝে দু ভাগ করা একরকম চশমা বেরিয়েছে। কাঁচের উপরের অংশ দিয়ে দেখা যায় দূরের জিনিষ, আর নীচের অংশ দিয়ে কাছের জিনিষ। এই চশমা করতে টাকা দশেক খরচ পড়বে।

সেদিন দাদা দলংঘাট বাজার থেকে বোঝা নিয়ে পরাঞ্জয়ের বাড়ী ফিরেছিল। সেদিন বাজারে ভোগরাম একটাও জামা কাপড় বিক্রী করতে পারেনি। বাজারে তার ফুলগুড়ি হাটের অবস্থাই হয়েছিল। দিন তিনেক আগের থেকে অর্থাৎ আগষ্ট মাসের পনের তারিখ থেকে নগাওঁ থেকে দলংঘাট পর্যন্ত দিনে দু খানা করে বাস চালু হয়েছে। দলংঘাটের রবিবারের বাজারে ঢাকাইপট্টি ব্যবসায়ীদের ভীড়। মঙ্গলবার জাঁজরির বাজারেও তাব একই অবস্থা হবে। ওই মাসের মধ্যেই সে ব্যবসায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। তার ফলে মূলধনের টাকা ভেঙ্গেই তাকে সংসাবের খরচ চালাতে হবে। সেই টাকা আর কতদিন? সেই টাকা শেষ হলে হয়তো তার প্রিয় সাইকেলখানা বেচতে হবে। তার পরে হয়তো যে তিন একর জমি আছে তাও বিক্রী করে দিতে হবে মোলাই মহরীকে। মোলাই তার ধারের পঁচিশ টাকা চাইতে একদিন সে অপমান বোধ করেছিল। কিন্তু মোলাইর কথাই মিলে গেল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এমন দিন আসবে যে ভোগরাম তার পৈতৃক সম্পত্তিও তারই হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। মনের এরকম অবস্থাতে বাসন্তী মায়ের জন্য চশমা কেনার কথা বলায় ওর গায়ে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। বিড়ির টুকরোটা বিতৃষ্ণায় দূরে ছুড়ে সে তিক্ত স্বরে বাসন্তীকে বলে,—তোরা দেখছি সবাই মিলে আমাকে শেষ করে দিবি। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত না মেড়োদের গাড়োয়ান হচ্ছি ততদিন পর্যন্ত তোরা আর আমায় রেহাই দিবি না। আমি সব টের পেয়েছি। মায়ের চশমা দরকার, তোরও কি একটা চশমার দরকার নেই? মেয়েদের এখন চশমা লাগিয়ে স্টাইল করে বেড়াবারই তো দিন।

এতদিন দাদা ওকে কোন কড়া কথা বলেনি। দাদা ওকে স্নেহ করে, বাসন্তী জানে। কিন্তু আজ হঠাৎ ভোগরাম ওকে এমন ভাবে বলাতে, হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে বাসন্তী। ওখান থেকে চলে এসে শোবার ঘরে যায়। রাত্রে তরুলতা আর সুজলা অনেক কাকুতি-মিনতি করেও ওকে ভাতের পাতে বসাতে পারেনি। রাত্রে ওর চোখের দু পাতা এক হল না। চোখের জলে বালিশ ভেজে। সোনাই পারের যুবতী এবার সহিষ্ণুতার কাছে হার মানে। ভোগরামকে ওর শত্রু মনে হল। ও যে জায়গায় জন্মেছে সেটা যেন একটা কারাগার মনে হয়। সুজলা আর তরুলতার স্নেহমাখানো স্বর ওর কাছে কপটতার ইংগিত বয়ে নিয়ে আসে। প্রায় চার মাসের মাথায় আজকে ওর ধনঞ্জয়কে বিশেষভাবে মনে পড়ে গেল। ধনঞ্জয় আজকে ওর কাছে দেবতার রূপ নিয়ে এসে হাজির। ওর হৃদয়ের সংযম বাঁধ কূল উপছে ভেসে গেল। অকস্মাৎ অমাবস্যার অন্ধকারে যেন ও উল্কার আলো দেখতে পায়। ওর জীবনের প্রথম পুরুষটির চিন্তা ওকে যেন জীবনী সঞ্জীবনী যোগায়। পরদিন থেকে ও আবার আগের বাসন্তী হয়ে পড়ে। ও আবার ঠান্নুয়া ঘাটে আম, জাম, কদম, কলাগাছের তলায় বসে থাকতে সুরু করে। শরৎকালের সোনাইএর স্ফটিক জলে ও নতুন সংসারের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। ছলাৎ ছলাৎ করে দাঁড় টেনে চলেছে মাঝি। তারই গানে শুনতে পায় সে সুদূরের ঈপ্সিত পূর্ণ ইংগিত। তাই এখন সোনাইর পারে অনেকক্ষণ বসে থাকলেও একঘেয়ে লাগে না বাসন্তীর।

বৈঠকখানা ঘরটা আবার সাজায় আগের মত করে। শোবার ঘরটায় কয়েক জায়গায় উই ধরেছে। রান্নাঘরের একদিকে বেড়া ভেঙে গেছে, সেদিক দিয়ে অনায়াসে শেয়াল ঢুকতে পারে। ভাঁড়ার ঘরটা উত্তর দিকে হেলে পড়েছে। ঘরের সব জায়গায় এমন কি সবার মুখে ও পোষাকেও অভাবের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এমন ভাঙা-চোরা অবস্থাতেও বৈঠকখানাটা সাজাতে বাসন্তীর খারাপ লাগে নি। কে জানে যদি একদিন ধনঞ্জয় আসে। সে এসে ওদের বৈঠকখানাটা

দেখে নিশ্চয়ই ওর মনের খবর পাবে। লঠাগাছে[১] কচি কিশলয়ের আবির্ভাব বসন্তের আপন গৌরব ঘোষণা করার মতই বাসন্তীর প্রেম-তৃষ্ণা প্রাত্যহিক দৈন্যকেও মধুর করে তুলেছে।

শরতের মেঘ নানা রঙ মেখে আকাশে লুকোচুরি খেলে। হেমন্তের আবির্ভাব সোনাইপারের জীবনে নিয়ে আসে বিশ্রাম। গাছ ফলে ভরে যায়। ধানের শীষ ওঠে। জল কমে যাওয়াতে খাল বিল শুকিয়ে গেছে। জেলেরা এখন সোনাই নদীতে মাছ ধরছে—রুই চিতল আরও কত কি! আজ হেমন্তের স্থির বাতাসে আনন্দের জোয়ার আসে। বাঁহী,[২] পেপা[২] আর গগনা[২] বাজিয়ে সোনাইপারের ছেলেরা উত্তাল। ধানের গোলায় আবার নতুন ধান ভরে উঠেছে। সোনাইপারের লোকেরা কাঙালী কাতি-বিহুর[৩] দুঃখ ভুলে যায়।

অবশেষে একদিন ওদের বাড়ীতে ধনঞ্জয় এসে উপস্থিত। ভোগরাম আজকাল প্রায় সময়েই বাড়ীতে থাকে। কিছুক্ষণ সে ভোগরামের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। বাসন্তী ওর সামনে দিয়ে দু বার যাতায়াত করে। ওদের দু জনের আজ একসঙ্গে শহরে যাওয়ার কথা। ভোগারামের যে কয়েক বিঘে জমি আছে তাতে চাষ করার কথা ভাবছে ও। কিন্তু চাষের বলদ কথায়? সেজন্য কৃষি ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করছে। সে একখানা দরখাস্ত দেয়। শহরে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের চেনা আছে আর ও ওদের অফিসারকে বুঝিয়ে বলতে পারবে বলেই ভোগরাম ধনঞ্জয়ের সাহায্যে ঋণ পাবার আশা রাখে। সেজন্য ভোগরামের অনুরোধে ধনঞ্জয় অনেক দিন বাদে এখানে এল। সে কিন্তু বাসন্তীর ব্যবহারে ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ। মাস তিনেক আগে সে যখন এসেছিল বাসন্তী তখন ওর সামনে বার হয়নি। ঠানুয়া ঘাটেও ওকে দুদিন দেখতে পেয়ে বাসন্তী দৌড়ে পালিয়েছিল।

---

১ একপ্রকার গাছ।

২ বাহী, পেপা ও গগনা—বাঁশী ও একপ্রকার আসামের বাদ্যযন্ত্র।

৩ কাতি-বিহুকে কাঙালী বলে, কারণ এসময় গরীব দুঃখীদের ভোজন করান হয়।

ধনঞ্জয়কে বসিয়ে রেখে ভোগরাম ভাত খেতে বসে। ধনঞ্জয় ভাত খেয়ে এসেছে বলে ওকে এক পেয়ালা চা দিতে বলে ভোগরাম। বাসন্তী চা নিয়ে ওর সামনে দাঁড়ালো। সে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। কোন কথা বলে না। ওর 'চা' কথাটা বলতে সে না শোনার ভান করে। বাসন্তীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে। ওর নাক থেকে জল পড়ার শব্দে অবশেষে ওর পুরুষ-হৃদয় সিক্ত হয়। সে বাসন্তীর দিকে তাকায়। ওর সজল নয়ন দেখে সে বিচলিত হয়ে পড়ে। গলায় অসম্ভব বেদনা মিশিয়ে ডাকে—বাসন্তী।

—ধন! বাসন্তী আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

—তুমি, তুমি আমাকে কেন এতদিন জানাওনি যে, তুমি আমাকে একান্তই নিজের মনে কর। আমি অতি সাধারণ একজন লোক। আমার মা নেই, বাবা নেই, কেউ নেই। আমি একজন অজ্ঞাত কুলশীল।

—কখন থেকে তুমি এত নিষ্ঠুর হতে শিখলে? আমাকে শাস্তি দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও? এই চার মাস ধরে তুমি একদিনও এলে না কেন?

—আমার সময় ছিল না বাসন্তী। গাঙচিলায় কলেরা মহামারী হয়েছিল। মানুষ কুকুর শেয়ালের মত মরে পড়েছিল। ওদের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করলেও একটা চিন্তাই আমাকে দিনরাত পীড়িত করতো আর তাছাড়া তুমিও যে···

—সেসব কথা মুখে এন না ধন! দোহাই! আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

—আমার চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কথা বলতে পার?

—আমি অন্তর থেকে বলছি, তোমার জন্য আমি সব কিছু ছাড়তে পারি।

ওর কান্নার ধনঞ্জয় বড়ই বিচলিত বোধ করে। সে বাসন্তীকে বলে—এখন ভোগরামের অবস্থা খুবই খারাপ, এখন ওকে জানিয়ে কিছুই লাভ নেই। ওর অবস্থা ফিরলে ওকে কথাটা জানাব। বুঝলে?

ধনঞ্জয়ের মুখ থেকে এমন কথা শুনে বাসন্তী নির্বাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকায়। ভিতর থেকে ভোগরামের গলা শোনা যায়—ডাক্তারকে চা-টা দিয়েছিস? স্বরটা বৈঠকখানার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে বাসন্তী মুহূর্তের মধ্যেই সেখান থেকে উঠে পড়ে আর ভিতরে চলে যায়। ওর মনের মধ্যে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে। ধনঞ্জয় আর ভোগরামকে শহরে যেতে দেখে বাসন্তী ভাবে—শ্যালক ভগ্নীপতি হিসেবে ওদের বেশ মানাবে। ও ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানায়—ভোগরাম যেন আজকেই অনেক টাকার কৃষিঋণ পায়। তাড়াতাড়ি সে যেন ভাল চাষী হয়ে পড়ে। গোলাভরা ধানের মালিক হোক। মনে মনে ও জোড়া নামঘরে জোড়া প্রদীপ তেল মানত করে।

নয়

বিকেলবেলা বাড়ী এসে পৌঁছাল ভোগরাম। উঠোনে আসতে না আসতেই ছেলেমেয়েরা ওকে ঘিরে ধরে। একেবারে ছোটটা ধুতি ধরে টানতে থাকে। মালচ সাইকেলের পাদানীতে পা দিয়ে দেখে। আর মেজো মেয়েটা 'বাবা আমি চড়বো' বলে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকে। ওরা সর্বদাই এরকম করে থাকে। আজ কিন্তু ভোগরাম আর সহ্য করতে পারে না, ঠাস্ করে মালচের গালে এক চড় মারে। বাকী সবাই ভয়ে পালায় এদিকে ওদিকে। ভোগরাম চেঁচিয়ে বলে—কোথা থেকে এলেই আপদগুলো এসে ঘিরে ধরবে। মরেও না এগুলো।

বাইরের ঘর থেকে বাসন্তী লক্ষ্য করছিল সবই। ওর মনটা দমে যায়। নিশ্চয়ই ভোগরাম কৃষিঋণ পায়নি। সে ঘরে ঢুকতেই তা বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। আসলে কথাটা সত্যি। শহরের

ঋণ দেওয়া অফিসারটিকে ধনঞ্জয় অনেক মিনতি করে বলে। ভোগরামও তার নিঃস্ব অবস্থার কথা যা পারে গুছিয়ে বলে। কিন্তু অফিসারটি অনড়। তার অন্তর কোমল হ'ল না এদের কথা শুনে। তিনি বললেন যে ব্যবসায়ী লোককে কিছুতেই ঋণ দেওয়া যায় না। চাষীদের তাড়া তাড়া দরখাস্ত তাঁর টেবিলের ওপর পড়ে আছে। তাদের দেওয়ার জন্যই টাকা কুলোবে না। তাছাড়া এই ধরণের ঋণ পেতে হলে অনেক সরকারী নিয়ম কানুন আছে। সেই সমস্ত নিয়ম মেনে চলার পর, ঋণ পেতে হ'লে অন্ততঃ ছটি মাস লেগে যাবে। অফিসারটি কথা শুনে ধনঞ্জয়ের রাগ হয়। আসামের কৃষিজীবনের ব্যর্থ রূপ তাকে হতাশ করে তোলে। সরকারী অফিসারের সহানুভূতির অভাব তাকে নিরাশ করে।

ঋণ পাওয়ার একটুও আশা দেখতে না পেয়ে ভোগরাম নিরাশ হয়। উন্নতির সকল দ্বার তার কাছে রুদ্ধ।

কিন্তু অবশেষে একদিন তার কপাল খুলল। একদিন হঠাৎ তার বাড়ীতে এক প্রতিষ্ঠাবান লোক এসে হাজির হয় আর তার দ্বারাই ওর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়।

পাঁচ বছরের মাথায় সোনাইপারের গ্রামগুলোতে আবার অন্য রকম উত্তেজনা দেখা দেয়। সোনাইপারের লোকেদের একেবারের 'মাঘ-বিহু'তে লক্ষ্মী উপছে পড়ে। বিহুর পেপা, ঢোল বাদ্যির বাজনা আর মাঘ মাসের আনন্দ অধীর বাতাসে যুবক-যুবতীর মন যেন কাপাস তুলোর মত উড়ে যায়। বিহু-নাচে যৌবনের ছন্দ ফুটে ওঠে। কোন সেউতী মালতী তাঁর প্রিয় বিরহে নিরানন্দ। তাই তারা নিজেকে ভোলার জন্য ভক্তিরসে গদগদ।

জায়গায় জায়গায় বাঁশের সেতু তৈরী হয়। সোনাইর এপার ওপার একাকার। দেওরা, গাঙচিলা আর বিহুমল মাঠে ময়ের যুদ্ধ হ'ল। বাওধান আর শালিধানের লম্বা শীষ পেকে সোনালী হয়েছে। সেই সব ক্ষেত-প্রান্তরে আজ লোকের সমাগম। ভোটের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এইবারে ভোটে কাকে নির্বাচিত করা হবে। ভোটটা কাকে

দেওয়া হবে—কথার ফুলঝুরি উকীলকে না ভাল লোক একজনকে ? ‘অমুক’কে দিলে কিন্তু শিলঙে গিয়ে ইংরাজী বলতে পারবে না। ওমুক’কে দিলে ইংরাজীতে খৈ ফোটালেও আমাদের জন্য কিছু করবে না। বারে বারে ভোট দিয়ে আমাদেরই বা কি উপকার হয়েছে। একজন অভিমত দেয়—যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।

মাঘের প্রথম দিকে ভোটপর্ব সুরু হয়। রাস্তায় রাস্তায় সুন্দর সুন্দর মোটর গাড়ীর শোভাযাত্রা। শহরের সুখী প্রাণীরা এখন সোনাইর ওপারের খট্‌খটে রাস্তাতে তাদের শ্রীচরণ যুগলের পরশ দিয়েছে। ওই সুন্দর লোকগুলো সভাসমিতিতে সুন্দর সুন্দর কথা বলছে। সোনাইর পারে এসেছে অকাল বসন্ত। এই নতুন বৈচিত্র্য সোনাইয়ের লোকেদের মন কেড়ে নিয়েছে। অনেকে দেখছে সোনালা স্বপ্ন।

মাঘ মাসের দিন চারেক পার হবার পর এমনই একটা দিনে সেই লোকটি ভোগরামের বাড়ী এসে হাজির। ভোগরাম ওকে আদর-যত্ন করে ভিতরে এনে বসায়। উনি যা-তা লোক নন। শহরের বিখ্যাত উকীল সুবোধ সইকীয়া। দেশে তাঁর নাম শোনেনি এমন লোক বিরল। তাঁর ক্ষমতা রাজার ক্ষমতার মতই। তাঁর কোপদৃষ্টিতে পড়লে শহরের বড় বড় লোকই ত্রাহি মধুসূদন বলে। আর ওঁর কৃপাদৃষ্টিতে রাম শ্যাম যদু মধুও যজ্ঞেশ্বর মহেশ্বর হয়ে যায়।

সুবোধ সইকীয়া চেয়ারে বসেন। চওড়া চশমটা খুলে রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলেন—তোমার নাই তো ভোগরাম, তাই না ?

ভোগরাম বিনীত ভাবে বলে—আজ্ঞে স্যার।

তিনি চশমাটা পরে নিয়ে বলেন —হ্যাঁ তোমার নাম অনেক দিন ধরেই শুনছি। আজকেই চাক্ষুস দেখতে পেলাম।

কথাটা শুনে ভোগরামের মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। সে বিনীত ভাবে বলে, আমি কি এতোই নামের লোক ?

—তুমি নামী কি অনামী, এই কথা তুমি ভালই বোঝ। কিন্তু আমি তোমাকে তার চেয়েও উপরে স্থান দি। বিয়াল্লিশের

আন্দোলনের কথায় এই অঞ্চলে বার হলেই, তোমার নামটা মনে পড়ে।

বিয়াল্লিশে ভোগরামের বাবা জীবিত ছিলেন। সে তখন ছিল স্বাধীন, আর ভলান্টিয়ারের কাজ করে ঘুরে বেড়াত। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সে মেসিনে তৈরী ও বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে দিত। সোনাই-পারের গ্রামবাসীদের সে বুঝিয়ে দিত বিদেশী কাপড় বর্জন করতে হবে। কিন্তু কালের গতিতে পরবর্তী কালে ওকেই কলে তৈরী কাপড়ের ব্যবসায় করতে হ'ল। সাব ডেপুটি অফিসারের গেটের সামনে শুয়ে সে পিকেটিং করত এক সময়ে। সেই অফিসেই জাতীয় পতাকা ওড়াতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। হাতে বেয়নেটের খোঁচা খেয়েছিল, এখনও তার দাগ আছে। আহত অবস্থাতেই সে গ্রেপ্তার হয়। শহরেই তার চিকিৎসা হয়। ছ মাস সে জেলে ছিল। সুবোধ সইকীয়ার কথায় আজ তার এই সব কথা মনে পড়ে।

সইকীয়া বলেন—তোমায় এবার আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি জানি, এই অঞ্চলে তোমার খুব প্রভাব, লোকেরা তোমার কথা শোনে। আমি এবার এই অঞ্চল থেকে দাঁড়াচ্ছি।

সইকীয়া খুবই চালাক। তিনি ভেবে নিলেন যে, ভোগরাম ব্যবসা করে ঘুরে বেড়ায় বলে অনেক লোককে চেনে এবং তারা কে কি ধরণের লোক সে কথা জানে। সেজন্যই এমন একজন লোককেই তাঁর দরকার। তাছাড়া বিয়াল্লিশে তার ভালো রেকর্ড আছে। ও দেশের কথা বললে, সেগুলো কাজে লাগবে। ভোটের খেলায় এমন লোকেরও ধনকুবের ব্রিজমোহন নন্দলালের মত বড়ই প্রয়োজন।

ভোগরাম সইকীয়ার প্রস্তাবে একটু আপত্তি করে। সে বলে যে পরিবারে রুজি রোজগারের চিন্তায় মরে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় তার জনসাধারণের কাজ করার মনও নেই, ইচ্ছাও নেই।

সইকীয়া একটা অর্থপূর্ণ হাসিতে ওর কথা নাকচ করে দেয়।

ভোগরামকে যতটা পারে সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন চতুর ভোগরাম সব বুঝতে পারে।

পর দিন সকালে আবার এলেন সইকীয়া। এইবার দুজনকার খোলাখুলিভাবে আলোচনা হয়ে গেল। সইকীয়া বলেন যে, আজকাল 'উইভিং লোন' বলে একরকম ঋণ পাওয়া যায়। আর ভোগরামের সংসারে তিনজন মহিলা থাকার দরুণ দেড় হাজার টাকা পেতে পারবে অনায়াসেই। এই ঋণ তাড়াতাড়ি পরিশোধ করতেও হয় না। সইকীয়া তাড়াতাড়ি ওই ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা করে দেবেন বলেন। তখন আর ভোগরামের রোজগারের চিন্তা করতে হবে না।

সইকীয়ার কথায় ভোগরাম হাতে যেন স্বর্গ পায়।

পরের দিন সুবোধ সইকীয়া এসে জানালেন দু হাজার টাকার উইভিং লোন মঞ্জুর হয়েছে। মাঘের মধ্যেই সুজলা ও তরুর নামে টাকা পাওয়া যাবে।

এই কথা বলে তিনি ড্রাইভারকে ডাকেন। ড্রাইভার জীপের ভিতর থেকে নতুন চক্‌চকে সাইকেল একটা ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে।—এই নাও, এই সাইকেলটা তোমায় দিলাম। তোমার ঘোরাঘুরি করতে সুবিধে হবে। তুমি যাকে যাকে সঙ্গে নেবে তাদের যদি সাইকেলের দরকার হয় তো জানাবে। ড্রাইভার, লিফলেটগুলো নিয়ে এসো।

ড্রাইভার বড় হরফে কতকগুলো ছাপা কাগজ এনে সইকীয়ার সামনে রাখে। সেগুলো ভোগরামকে দিয়ে সইকীয়া বলেন—ক্যানভাস করার সময় তোমার একটা বিশেষ কথা বলতে হবে। বলবে যে, সোনাইর পার পর্যন্ত কাঁকর বিছানো রাস্তাটা আমার চেষ্টাতেই হয়েছে। সার্ভিস বাসের লাইনটা আমিই মঞ্জুর করিয়েছিলাম।

এই কথা শোনা মাত্রই ভোগরামের শরীরটা যেন জ্বলতে থাকে। ওর চোখ দুটো হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে। আক্রোশে কান দুটো লাল হয়। কাঁকুর বিছানো রাস্তাটাই তো ওর সর্বনাশের মূল কারণ। সব কথা আগাগোড়া সে সইকীয়াকে বলে। ধৈর্যসহকারে সইকীয়া

তার কথা শুনে যান। বলেন, হাজার হাজার টাকা খরচ করে তবে রাস্তাটা হয়েছে। তোমার কাছে অপ্রিয় হ'লেও সত্যি কথা বলতে আপত্তি নেই।

—আর বলবেন না স্যার। এই রাস্তাটা আমাকে দেউলে করে দিয়েছে। আর এই রাস্তাটাই একদিন সোনাইপারের লোকেদের সুখ শান্তি নষ্ট করবে।

—তুমি এখনও বোকা হয়ে আছ ভোগরাম। সময়কে আর অবস্থার পরিবর্তনকে তুমি কখনও অস্বীকার করতে পার না।

সইকীয়া আরও কিছু বলে যান। ভোগরাম ওর কথায় সব ভুলে যায়। সে সইকীয়ার কাছে হার মানে। পরের দিন থেকে ভোগরাম সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকা গ্রহণ করে। সোনাইপারের লোকের মধ্যেই সে নতুন আশার আলো দেখতে পায়।

দশ

সোনাইর পারের লোকেদের যা বলা যায় তাই তারা সহজে বিশ্বাস করে। ভোটের দিন এগিয়ে আসছে তাই সভার নানা আয়োজন করা হচ্ছে, বিভিন্ন দলের লোকেরা এদের নানা কথা বলে। কে যে ভোট পাবার উপযুক্ত, কাকে ভোট দিলে দেশের উন্নতি হবে, এইগুলো তাঁদের কাছে সব গরমিল হয়ে যায়। সহজ সরল লোককে নানা কথা বলে ভোলানো সহজ। এই গ্রামের লোকেরা অতশত রাজনীতি বোঝে না। 'গান্ধী রাজা'র আমলে তারা অনেক কিছু বুঝত। এখন তাদের অবস্থা খারাপের দিকে গেলেও তাঁরা এর জন্য দোষ দিচ্ছে অদৃষ্টকে।

শিলঙের রাজ্য বিধানসভার জন্য তিনজন লোক প্রতিযোগিতা করছেন। বাকী দুজন হ'লেন সঞ্জীব বরুয়া এবং লোকনাথ তামুলী।

সঞ্জীব বরুয়ার দলে অনেক লোক। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে এই অঞ্চলে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য বৃটিশ সরকার দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। সোনাইর গ্রামে যখন তিনি আত্মগোপন করেছিলেন তখন গ্রামের মুরুব্বীদের সঙ্গে তাঁর বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। এখনও এই অঞ্চলের লোকেরা তাঁকে ভালবাসে। তিনি প্রায়ই গ্রামে আসেন। বন্যা এবং মারীমড়কের সময় তিনি গ্রামের লোকেদের অনেক সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন।

ভোটের দিন চারেক আগে বোঝা গেল যে প্রধান প্রতিযোগিতা হচ্ছে সুবোধ সইকীয়া এবং সঞ্জীব বরুয়ার মধ্যে। সঞ্জীব বরুয়ার দলের লোক বলে বেড়াচ্ছে, "ভাইসব, আপনাদের ভোটের জোরেই সরকার বদলি হবে। তখন আপনাদেব দুঃখ ঘুচবে। সইকীয়া মিটিং করে জেল খাটতেন। জেলে তিনি ঘি মাঘন খেয়ে মহাসুখে দিন কাটাতেন। কিন্তু আমাদের সঞ্জীব বরুয়া বৃটিশ সিংহ যাকে ধরতে পারল না, সেই লোকটি......"

সুবোধ সইকীয়ার লোকেরা বোঝায়, "জনগণ, সইকীয়া মহাশয় এবার প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করলেই মন্ত্রী হবেন। তখন আর আমাদের সোনাইপারের লোকেদের দুঃখ থাকবে না। পোল হবে, ব্রিজ হবে, স্কুল হবে আরও কত কি হবে! সোনাইপারের লোকেরা ভালো চাকরী পাবে। কিন্তু সঞ্জীব বরুয়া সাধারণ একটা পার্টির মেম্বার হয়ে কি করবেন? শিলঙে মাসকাবারী টাকা নিয়ে বসে থাকবেন মাত্র।"

গত পাঁচ বছর সোনাইপারের গ্রামগুলোর লোকেদের অবস্থা খারাপ হলেও তাদের মধ্যে একতা ছিল। ব্রাহ্মণেরা নীচু জাতকে হেয় জ্ঞান করতেন না। খলপীয়া গাঙচিলার মৈমনসিঙের মুসলমানেরা যে আলাদা ধর্মের লোক তা এতদিনে তাদের মগজে ঢোকে। কলিতা অর্থাৎ কায়স্থ জাতেরও যে নানা স্তর আছে যেমন পানী কলিতা, নট কলিতা, কুমার কলিতা, সোনারি কলিতা, তাও এতদিনে তারা টের পেল মাত্র।

ভোগরাম ভোটের যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। মুখে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। ওর হাতে এখন অনেক ক্ষমতা। সুবোধ সইকীয়া এই কদিনের জন্য ওকে একটা জীপ গাড়ী দিয়েছেন। ফলে ওর দলে অনেক ক্যানভাসার খাটছে। সইকীয়ার কাছ থেকে তাদের প্রত্যেকের জন্যই সে এক একখানা করে সাইকেল আনিয়ে দিয়েছে ও তাদের হাত খরচ দিয়েছে, কেমনভাবে লোকদের বোঝাতে হবে তাও শিখিয়ে দিয়েছে। উত্তর দিকে মোটর গাড়ী যায় না বলে ওর সময় বেশী লাগছে, ওর খাবার ঘুমোবার সময় নেই মোটেই, তবুও এই কাজে ঘুরে বেড়াতে ওর নেশা লেগেছে।

সোনাইপারের গ্রামগুলোতে হৈ হুল্লোড় আর আনন্দের কোলাহল। বেকার যুবকদের কর্মচাঞ্চল্য এই নীরব গ্রামগুলোকে মুখর করে তুলেছে। সহরের চোরা কারবারীরা এখন জাতীয় স্বার্থের বিষয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, তারা সুবোধ সইকীয়ার নৈতিক মানদণ্ডের কথা বলে বেড়াচ্ছে। এখানে এসে স্বার্থান্ধ বণিকেরা বদান্যতার অসামান্য নিদর্শন দেখাচ্ছে। শাইলকের মত ধনী ব্যবসায়ীরাও তাদের টাকার বস্তার বজ্র-আটুনি খুলছে। মোটের উপর তারা তাদের কথার চমক্‌দারীতে এই সহজ সরল লোকদের ভুলিয়ে দিচ্ছে।

ভোগরামের দল জলমৈ গ্রাম রাইডিঙীয়া ও চাবুকধরাতে লোকদের বশে এনেছে। কিন্তু গাঙচিলা, কুঁজী এবং বরবরিতে আলাদা ব্যাপার। এইসব অঞ্চলে ধনঞ্জয় খুবই প্রতাপশালী। এই সমস্ত লোকেরা ওর ছাড়া অন্য কারুর কথা শোনে না। সোনাইর উত্তর পারে সে দেবতা। ওদের অসুখ-বিসুখে ধনঞ্জয় চিকিৎসা করে; বিপদ-আপদে সাহায্য করে। সবাইকে সে সমান চোখে দেখে। এর চেয়ে আর বেশী কি চাইবে সোনাইপারের লোকেরা? ধনঞ্জয় এইসব লোকেদের মিলিত সভায় বলেছে,—"ভাইসকল, মনে রাখবেন, চক্‌চকে জিনিষ মানেই সোনা নয়। আমাদের এমন লোককে ভোট দিতে হবে যে জনসাধারণকে তার

নিজের লোক বলে ভাবে এবং তাদের সুখ-দুঃখকেও নিজের মনে করে নেয়। যে কয়জন লোক প্রতিযোগিতা করছে তার মধ্যে সঞ্জীব বরুয়াই ভাল লোক। তাঁর উদ্দেশ্য সৎ এবং উপায়ও সৎ। সইকীয়ার উদ্দেশ্য সৎ হতে পারে, উপায় সৎ নয়। ঐ ধরণের লোক দেশের উপকার করতে পারে না।......"

গ্রামবাসীরা ওর কথায় সায় দেয়। সাধারণ, অতি সাধারণ কোথাকার একটি ছেলে এসে সবার মন কি করে কেড়ে নেয়, আশ্চর্য! প্রবল প্রতাপশালী সুবোধ সইকীয়া প্রমাদ গুনতে থাকে। ভোগরামের মনে ঝড় বয়ে যায়। সে ভাবে, লোককে বোঝা বড়ই শক্ত। অবশেষে ধনঞ্জয়ও তার সঙ্গে শত্রুতা করল? নিজের ভাইয়ের মত স্নেহ করত ওকে, বড় ঘরটায় আসন পেতে ওকে জলখাবার খাওয়াতো। এখন কিনা সেই আবার ভোগরামের সামনে অন্য মূর্তি ধারণ করছে। ধনঞ্জয়ের জন্যই কি তা হলে ভোগরামের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাবে? সত্যি তো এরকম লোকেদের মানে যাদের কেউ কোথাও নেই, যাদের কোন ঠিক-ঠিকানা নেই, তারা খুবই দুর্বোধ্য চরিত্রের হয়।

সুবোধ সইকীয়াও গাঙচিলায় গিয়েছিলেন। উনি যাবেন বলে ভোগরাম সেখানে কোন মিটিঙেরই ব্যবস্থা করতে পারলেন না। গ্রামের ছেলেরা সইকীয়া ও ভোগরামকে ঠাট্টা তামাসা করতে থাকে। ফলে সাইকীয়ার ধনঞ্জয়ের প্রতি আক্রোশ জন্মে। কিন্তু চোরা সাপের মত ফোঁস তুলতেও পারে না। এখন তো আর ফোঁস করলে চলবে না, এখন হচ্ছে জনতার পায়ের ধুলো নেওয়ার সময়। সে মনে বিষ আর মুখে মধু ঢেলে ধনঞ্জয়কে ওর দলে টেনে নিতে চেয়ে বিফল হয়। ধনঞ্জয় সইকীয়াকে নাকি বলেছিল—যাকে তাকে কেনা যায় না সইকীয়া। ক্ষমতার লোভ আপনাকে পেয়ে বসেছে।

কথাটা কিন্তু সত্যি। দিন দুয়েক আগে সে গিয়েছিল ম'য়াপুরের দিকে। সেখানে একদল ছেলে তাকে ঘিরে ধরে গালিগালাজ করে, এমন কি একজন ছেলে তার জামা ধরে টানতেও ছাড়েনি। অথচ

এই ছেলেগুলোর মা বাবার কাছে ধনঞ্জয় নিজেদের ছেলের মতনই। সুবোধ সইকীয়ার থেকে টাকা নিয়ে এইসব ছেলে এখন গুণ্ডা হয়ে গেছে। মাড়োয়ারীর দেওয়া চক্‌চকে সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মদ খাচ্ছে, আর বড়দের সামনে মাতলামি করছে। সুবোধ সইকীয়া টাকা দিয়ে এদের অমানুষ করে তুলছে। ভোগরামের মত ভাল লোকও অমানুষ হয়ে উঠছে। বড়ই দুঃখের কথা। সোনাইর পার এখন পাপে ভরে গেছে।

নির্বাচনের আগের দিন গাঙচিলায় খুব বড় রকমের হৈ-চৈ হয়ে গেল! মাইনর স্কুলবাড়ীটার সামনে একটা অশ্বত্থ গাছ আছে, এর নীচে বসে গ্রামের লোকেরা তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলে। অশ্বত্থ গাছের গায়ে নানা রকমের নির্বাচনী ইস্তাহার······'জয় হল জনসাধারণের জয়'······'অমুককে ভোট দিন'······'এগিয়ে আসবে সুদিন'······'বাক্স হল কল্পতরু' 'লোকের মন দুরুদুরু'॥···ইত্যাদি। ভোগরাম সকালে সেখানে এসে যখন ওদের দলের পোষ্টার লাগাতে যায় তখন সেই গ্রামের ছেলের দল তা ছিঁড়ে ফেলে। ভোগরামের দলের ছেলেরাও এগিয়ে আসে। দুই পক্ষই মারামারি হাতাহাতি, ইঁট ছোঁড়াছুড়ি করতে থাকে। এমন সময় কোথা থেকে ধনঞ্জয় এসে উপস্থিত। তখন স্থানীয় পক্ষ নীরব। ধনঞ্জয় লক্ষ্য করে ভোগরামের জামা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো। দাঁত দিয়ে রক্ত ঝরছে। গাঙচিলার ছেলেদের ভোগরাম এক চোট বকুনি লাগাল। তারা নিমেষে শান্ত হয়ে যায়। একটা ছেলে শুধু বলে—তাদের এই দুদিন সোনাই থেকে পার হতে দেব না, মজা দেখাচ্ছি।

ধনঞ্জয় ওর কথা শুনেও না শোনার ভান করে রইল। ওকে বড়ই চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। সে ভাবছে যে, এরা যদি এরকম-ভাবে মার-ধোর করে তাহলে সঞ্জীব বরুয়ার অপকার করাই হবে। অদূরে পড়ে থাকা সাইকেলগুলো তুলতে যায় ধনঞ্জয়। গিয়ে দেখে সাইকেলগুলোর হাওয়া খুলে রেখেছে ছেলেরা, একটার তো প্যাডালও নেই। সে আস্তে আস্তে ভোগরামের কাছে এসে বলে,—

দাদা, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার জায়গাতে যে এ সমস্ত হ'ল··· তার জন্য······

ভোগরাম রাগে জ্বলে ওঠে। সেও নীরবে সহ্য করার মত লোক নয়। ওকে বলে—শালা, নিলর্জ, এখন ধর্মপুকুর যুধিষ্ঠির হয়ে সাধু সাজতে এসেছ? আমি যদি ভোগরাম হই তবে এর শোধ তুলব।

ধনঞ্জয় কিন্তু রাগ করল না। সে দলংঘাটের সুধনা মাঝিকে বলে তাদের পার করে দিতে। এর পরেও ভোগরাম ধনঞ্জয়ের প্রতি সদয় হ'ল না। কারণ মাঝিকে বেশী টাকা দিয়ে নৌকা চালাতে বাধ্য করবে বলে ওর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু মাঝি তাতে রাজী হয়নি।

বিকেলে আবার ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ভোগরামের দেখা হয়ে গেল। সে নিজে থেকেই কথা বলে। হয়তো ভোগরামের মনটা একটু নরম হয়েছে। সে বলে,—সঞ্জীবের জন্য কাজ করে তোমার লাভ কি? ধনঞ্জয় বিনীত ভাবে উত্তর দেয়—লোকে সব কাজ লাভ লোকসানের জন্য করে না। যে একটা বিশেষ আদর্শ মেনে চলে সেরকম লোককে আমি শ্রদ্ধা করি। সেজন্য আমি মনে করি সঞ্জীব বরুয়ার মত লোক নির্বাচিত হলে গণতন্ত্র স্থাপিত হবে।

'গণতন্ত্র' শব্দটা ভোগরামের কানে যেন অজানা সুরের মত বেজে ওঠে। সে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে আর কথা বলে না। সেদিন সন্ধ্যেবেলাই কয়েকটা গ্রামে ছেলেদের মদ খাবার জন্য টাকা দিয়ে আসে। গ্রামের পাণ্ডা গোছের দুটো ছেলেকে হাত করে নিজের দলে টানে। সুবোধ সইকীয়ার নির্দেশ অনুযায়ী দুটো গ্রামে প্রত্যেক পরিবার পিছু কুড়ি টাকা করে দেয়। দেওরা ও কুঁজী গ্রামের যে দুটো এজেন্টকে সঞ্জীব বরুয়া যোগাড় করেছিলেন তাদের এক একজনকে তিনশ করে টাকা দেওয়াতে ওরাও মত পালটায়।

নির্বাচন হয়ে গেল। সুবোধ সইকীয়া এগারশ উনপঞ্চাশ ভোটে জয়ী হল। সোনাইর পারের সেই মুখর কোলাহল এখন নিস্তব্ধ। দিনগুলো আবার ফিরে আসে আগের মতই। কিন্তু লোকেরা বড়

জটিল ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। কাজ করার চেয়েও তারা কথা বলতে বেশী ভালবাসে। জনসাধারণের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এক জাতীয় ভোগরামের দল উদ্ভব হল। ভাঙা নড়বড়ে সাইকেলে চড়ে বেড়ান ভোগরাম আজ প্রচুর টাকার মালিক। সুবোধ সইকীয়ার নির্বাচনের খরচের টাকার থেকে প্রায় আটশ টাকা আজ তার পকেটে আসে। দুজায়গায় দুটো থিয়েটার করার জন্য সইকীয়ার কাছ থেকে ভোগরাম দু হাজার টাকা নিয়েছিল, তাও সে আত্মসাৎ করেছে।

ফাল্গুন মাস না পড়তেই ভোগরাম একটা বারো হাজার টাকার কণ্ট্রাক্টরী পায়। কাজ আরম্ভ করার আগেই ছ হাজার টাকার রাণিং বিল মঞ্জুর হ'ল।

দেখতে না দেখতেই ভোগরাম ফুলে ফেঁপে ওঠে। সোনাইপারের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোক হয়ে আজ তার এই কথা মনে এল না যে—সে নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে—হারিয়েছে নিজেকে।

সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ভোগ করতে হ'ল বাসন্তীকেও। সে বুঝতে পারে যে, ভোটের কয়েকটা দিনের মধ্যেই ভোগরাম আর ধনঞ্জয়ের সম্পর্ক হয়ে গেল অহি-নকুল।

বৈশাখে সোনাইর পারে প্রকৃতি তার মহিমা বিকাশ করে। সোনাই নদী ভরা যৌবনে টলমল। খেত-খামার কর্মব্যস্ততায় ভরে যায়। কোকিল কেতকীর মিষ্টি সুর মধুর আমেজ নিয়ে আসে জীবনে। গাছের পাতা হ'ল সবুজ। সোনাইর পার ফলে ফুলে ভরে যায়। প্রকৃতি সৃষ্টির রহস্যে উর্বর। নববধূর উর্বর দেহে মা হবার চিহ্ন প্রস্ফুটিত। এই বৈশাখের বিহুতে কত যুবক যুবতীর দেহ-মনেরই না মিলন ঘটে।

চাষী বরণ করে মৌসুমীকে। লাঙলের ডগায় শস্য ভরে ওঠে, পলি মাটিতে শস্য বাড়ে। ধান পাটের ছোট ছোট চারাগুলোতে যেন নৃত্যের আন্দোলন।

বাসন্তীর মনও উতলা হয়ে ওঠে। ধনঞ্জয় কি আর ওদের বাড়ীতে আসবে না? সে নাকি ভোগরামকে অপমান করেছিল। নানা চিন্তা

ওর মনে। ওর দাদা কার সঙ্গে কথা বলছিল। কথাটা কানে গেল বাসন্তীর।—গাঙচিলায় সুবোধ স্যারকে ধরে যদি একটা সরকারী হাসপাতাল করা যায়, তাহলে আর ও ধনঞ্জয়কে পরোয়া করবে কেন? হাসপাতালে ডাক্তার এলে ওর হোমিওপ্যাথিক ব্যবসায়ও এক ফুঁতেই উড়ে যাবে। এক জায়গা থেকে যেমন ভাবে চলে এসেছিল, তেমন ভাবেই চলে যেতে হবে ওকে আরেক জায়গাতে······

এগার

বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে ভোগরামের কণ্ট্রাক্টরী কাজ শেষ হ'ল। হাতে কিছু টাকাও এল। ওর ব্যস্ততাও কমে যায়। এখন বর্ষার সময়। কখন মেঘ জলে আকাশ ভরে যায়। এখন বাড়ী মেরামত করার সময় নয়। ধরমতুল থেকে দুগাড়ী শালগাছ নিয়ে আসে। বড় ঘর আর বৈঠকখানাটা ভেঙে একটা সুন্দর বাংলো তৈরী করার ইচ্ছা তার। বর্ষা কমে গেলেই বাড়ী তৈরীর কাজে লাগবে বলে ঠিক করে ভোগরাম। ওর আর এখন বিশেষ কোন সমস্যা নেই। বোনকে একটা ভাল ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

এতদিন বাসন্তী যে আশঙ্কায় দিন কাটাত, অবশেষে তাই ঘটল। একদিন ভোগরাম চণ্ডাল রাগ নিয়ে ঘরে ঢোকে। তরু ওকে কি হয়েছে বলে জিজ্ঞাসা করাতে ওর রাগ যেন আরও বেড়ে যায়।

—তরু, তোমাকেও শেষে আমার অবিশ্বাস করতে হচ্ছে? এদিকে আবার তুমিই কি না বলে বেড়াও, যে যুবতী মেয়ে আর দুধ খাইয়ে পোষা সাপ একই।

—কি হয়েছে, কেন রাগারাগি করছ, খুলে বল না কেন?

—আমি এসব কি শুনছি?

—কি শুনেছ ?

—শেষ অবধি রাস্তার ছেলে একটা এসে আমরে বোনের সঙ্গে প্রেম করবে আর তোমরা চোখ বুজে তা দেখবে ? বুঝতে পেরেছি, এইসব তোমাদেরই চালাকি ! চোরে চোরে মাসতুতো ভাই ।

—কি বলছ, কিছুই বুঝতে পারছি না ।

—হ্যাঁ বুঝেও না বোঝার ভান করবে । মেয়েদের স্বভাবই এরকম । ঐ ধনঞ্জয় কুকুরটা আমার বোনের সঙ্গে ঘাটে বসে কথা বলে, চম্পক মেৰ্বি দেখেছে ওপার থেকে । অথচ, তোমরা কিছু জান না, চোখ কান বুজে বসে আছ, আশ্চর্য ! যেন কোন কথাই জানো না ?

— লোকের কথা বিশ্বাস কর কেন ?

—কোন কথাটা সত্যি, কোন কথাটা মিথ্যে, তাও কি আমি বুঝতে পারিনে ? সেজন্যই তুমি ওর বিয়ের কথা নিয়ে এত ওকালতি করেছিলে, এখন বুঝতে পেরেছি । মেয়ে পীরিত করবেন আর ওর বুকে শেল বিঁধবে ।

তরুলতা আর জবাব দিতে পারে না । রাত্রেও সে যেন চণ্ডাল । ছেলে মেয়েরাও ভয়ে তটস্থ । সারারাত বাসন্তীর ঘুম হ'ল না ।

সকালে উঠে ভোগরাম মাকে সব কথা বলে । মা কিন্তু ছেলের কথায় সায় দিতে পারে না । তাঁর মনে পড়ে যায় প্রায় দু কুড়ি বছর আগের কথা । ভোগরামের বাবার উপর তাঁর একদিন মোহ জন্মেছিল । বনের অবোধ হরিণ সে প্রথম ভোরের লাল সূর্যকে দেখতে পেয়েছিল । কিছুদিনের মধ্যেই এই মধুর বন্ধনে তিনি ধরা দেন । একদিন সোনাই নদীর উপর দিয়েই তিনি সেই প্রথম পুরুষজনের সঙ্গে চুপি চুপি চলে এসেছিলেন এবং নিজের সংসার রচনা করেছিলেন । সেই সময় সোনাই প্রেমের মূল্য বুঝেছিল । মানুষও তার অকৃত্রিম মূল্য দিয়েছিল । কিন্তু এখনকার দিনগুলো যে কি হয়ে যায় । ছেলেও মায়ের সামনে বলছে যে বোন বদমাসি করছে । এখনকার প্রেমে আর সেই আগেকার গভীরতা নেই । এখনকার লোকেরা প্রেমকে ছলনা বলে মনে করে ।

—মা, তুমিও যদি এই ভাবে কথা বল তো, দেশটার অবস্থা কি হবে ? আমি ধনঞ্জয়কে খুব ভাল করেই চিনি। সে সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়িয়েছে। মেয়েটার সে সর্বনাশ করতে চেয়েছে। তা ছাড়া কায়স্থ বাড়ীর একটা মেয়েকে ওর মত ছেলের হাতে কি করে তুলে দেব ? সে একটা ভেসে বেড়ান লোক। কোথায় ঘর, কি জাত, কিছু ঠিক নেই। নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে বলে বেড়ালে কি হবে, গাঙচিলায় যে ভাবে আছে তাতে মনে হয় ও শূদ্রই। মেয়েটাকে তো আর আগুনে ফেলে দিতে পারি না।

মা নীরব। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। মেয়ে হয়ে জন্মেছেন যখন তখন প্রথম বয়সে মা বাবার অধীনে, পরে স্বামীর অধীনে এবং বৃদ্ধ বয়সে ছেলের শাসনে চলতে হবে। ভোগরামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি তাঁর নেই। তবুও সে যদি ভাল ছেলে খুঁজে পায় তবে ভাববার কিছু নেই। ধনঞ্জয় যদি ওকে ফুসলাতে চেয়ে থাকে তা হলে ওদের মধ্যে প্রকৃত প্রেম ছিল না।

পরদিনই ভোগরাম এসে বলে যে, ও বর খুঁজে পেয়েছে। বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে ছেলেটার পরিপূর্ণ একটি সংসার। সৎ কায়স্থ পরিবার। বাড়ীর অবস্থা ভাল। অনেক জায়গা জমি আছে। দুটো ধানের গোলা আছে। ছেলেটার বাবা পেন্সন পান।

আগে হ'লে ভগীরথ কানুনগোর ছেলে মথুরা ভোগরামের মত লোকের বোনকে বিয়ে করত না। ভগীরথ সম্ভ্রান্ত লোক। কিন্তু এখন ভোগরামও বড়লোক-ধনী-মানী। কাজেই এদের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করামানে পরিবারটা আরও এক স্তর উঁচুতে ওঠা। ভোগরাম আজকাল অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে, সে আজকাল মান-সম্মানের কথা খুব বিচার করে। কানুনগোর বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়াতে নিজেকে ধন্য মনে করে। ভগীরথ কানুনগো আগের থেকেই বনেদী। তাঁর বাবার আমলে বাড়ীতে দুটো হাতী ছিল। তাঁদের বাড়ীটাকে এখনও লোকে হাতী-ধনীর বাড়ী বলে। ভোগরাম যখন ব্যবসা করত, সে সময় ওদের বাড়ীতে ঢুকতেও ভয় পেত সে।

এখন কপাল জোরে এমন দিন এল যে ভগীরথ যেচেই ছেলে মথুরার সঙ্গে তার বোনের বিয়ের প্রস্তাব করেন। এর চেয়ে আর বড় সম্মান কি হ'তে পারে?

পয়লা জ্যৈষ্ঠতে বরপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসেন। মা, বাবা ও বোন নিজেই এসেছিলেন। পাত্র আসেনি। ভোগরাম কখন যে ওকে লুকিয়ে বোনকে দেখিয়ে দেয় বাসন্তী টেরই পেল না সে কথা।

বরপক্ষ এসেছে শুনে বাসন্তীর বুক টিপ টিপ করতে থাকে। ও কোনমতে সাজতে চায় না। ওদের সামনে 'যাব না' বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। মা বলেন—লজ্জা করছিস কেন, মা? মিছিমিছি তুই আমার মনে কষ্ট দিচ্ছিস!

—তাই বলে মেয়ের নিজস্ব কোন একটা মত থাকবে না কি? মা না-শোনার ভান করেন। তখন বৌদি আর থাকতে না পেরে বলে—বাসন্তী, মেয়ে হলে বাড়ীর বড়দের হুকুম মেনে চলতে হয়। মা'র কথা যদি না শুনিস্ তা হলে তোকে এতদিন মানুষ করে কি লাভ হল? যুবতী মেয়ের বিয়ের কথা হলে একটু আপত্তি করে বৈ কি! তা বলে তো আর আইবুড়ো হয়ে কাটাতে পারে না কেউ? আমরাও কি একদিন নিজেদের ঘর বাড়ী ছেড়ে অন্যের বাড়ীতে যাইনি?

বৌদির কথায় বাসন্তী বেশী নিরাশ হয়। বলে,—বৌদি তুমিও কি আমার মনের কথা বুঝতে পারছ না।

তরু উত্তর দেয়—এসব বয়সের দোষ। যুবতী মেয়ের সময়ে সময়ে কাউকে ভাল লেগে যায়। তোমারও হয়তো কয়েকদিন মনে একটু দাগ বসেছিল, এই পর্যন্তই।

বাসন্তী খুব সমস্যায় পড়ে। কতকাল ও ওর মা, দাদা বৌদিকে ফাঁকি দিয়ে সোনাইপারের লোকেরা যার প্রকৃত পরিচয় জানে না, কোথায় কেউ নেই সেই ধনঞ্জয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে, আর অপেক্ষা করে নিজের ক্ষতি করবে না কি না কি ও, সে কি সত্যি ওকে ছলনা করে ওর দেহের আস্বাদ পেতে চেয়েছিল?

একটু পরে যখন বাসন্তীর দাদা ওর কাছে এসে বলে,—বাসন্তী,

শেষ অবধি তুই আমার মান-সম্মান ডোবাতে চাস? দেখ, আমার চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। তখন বাসন্তী বোঝে যে বাড়ী প্রত্যেকেরই ওর উপর অনেক স্নেহ! ওদের এই গভীর স্নেহস্পর্শে বাসন্তী গলে যায়। ভাবল, ভোগরাম না থাকলে বাড়ীটার অবস্থা কি হ'ত! কত কষ্ট করে ভোগরাম দুর্দিনে এই সংসারের বোঝা বয়েছিল। অন্য লোক হ'লে ওকে পরের বাড়ীতে ধান ভান্‌তে পাঠাত।

চোখের জল লুকিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে বেরুতে রাজী হ'ল বাসন্তী। তরু খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেয় ওকে। হাতে বাটা নিয়ে ও তরু আর মায়ের সঙ্গে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়।

মেয়ে দেখে সবারই পছন্দ হয়। দু একটা কথা জিজ্ঞেস করে সবাই খুব খুশী। ওকে যখন তাঁরা আংটি পরিয়ে দেন, সেসময় বাসন্তী অতর্কিতে অজান্তে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বরের মা অন্য কিছু ভাবলেন না। তিনি শুধু বলেন—কেন দুঃখ করছ মা? মেয়ে হয়ে জন্মালে তার নিজের ঘর একদিন ছাড়তেই হয়। একদিন পরের বাড়ীতে যেতেই হবে। আর দুদিন বাদে আমরা কি তোমার আপন হব না?

বাসন্তী ভিতরে চলে আসে। ভিতর থেকে ও শুনতে পায়, ছেলের বাবা বলছেন—তোমার যে একজন বোন আছে, এই কথা আমি মাস দুয়েক আগেই শুধু জানতে পারি। মথুরার জন্য যে কত মেয়ে দেখলাম। যার যেখানে হবার আছে তার সেখানে হবেই।

বার

আগের থেকে ধনঞ্জয় কোন খবর পায়নি। গত সপ্তাহে সে গ্রামে গ্রামে রুগী দেখতে ব্যস্ত। এবারে বর্ষার প্রথম দিকটায় খুব

বর্ষা হ'ল। সোনাইর জলে বন্যা না এলেও খাল-বিল, ক্ষেত খামার জলে ভরে যায়। সোনাইপারের লোকেরা মাছ ধরার সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু জল যখন শুকিয়ে যায় তখন সোনাইপারের লোকেরা হয় জ্যান্তে মরা। কেচু পোকা মরে, পচা আর শুকনো মাছে আর ময়লা আবর্জনায় দুর্গন্ধে ভরে উঠেছে সারা গ্রামটা। বায়ু বিষাক্ত হয়েছে। মাটি ভিজে বাতাস ভিজে। চারদিকে অসুখ-বিসুখ বাড়তে থাকে। সান্নিপাতিক জ্বরে, কলেরায় দেশে মড়ক লেগে গেছে। এখন উত্তরপারের লোকেদের জীবন কচুপাতার উপর টল্‌মলে জলের মত।

ধনঞ্জয়ের সাধ্যানুযায়ী সে লোকের বিপদে সাহায্য করতে থাকে। বাসন্তীর খবর নেওয়ার তার সময় কোথায়? ধনঞ্জয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী বলে সে বিচলিত হয়নি। উত্তর লক্ষ্মীমপুরে যে ভূমিকম্প হয়েছিল এবং তখন যে স্বামীজির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল তিনি ওকে উপদেশ দিয়েছিলেন দরিদ্র নারায়ণের সেবা করতে। তাঁর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে ধনঞ্জয়।

কিন্তু একজনের কাছে বাসন্তীর সব খবর পেয়ে হঠাৎ সে ঝিমিয়ে পড়ে। তার ধ্যান ধারণায় এবং সেবা করার অদম্য উৎসাহে ভাটা পড়ে। চাকুকধরা এবং দেওরাতে সেবা শুশ্রূষা করেছে অনেক। কুঁজীতে মাত্র তিনটি রোগী। আর নতুন কেউ অসুস্থ হয়নি। বাসন্তীর বিয়ের কথা শুনে ধনঞ্জয় হতাশ হয়ে পড়ে—আর ভাবতে পারে না কিছু। মনটা অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে—ধনঞ্জয় মনে করে যে সেও অন্যান্য সকলের মতই অক্ষম। ওর হোমিওপ্যাথিক জ্ঞান ও সামান্য আয়ুর্বেদীয় শিক্ষার দ্বারা যে মহামারী প্রতিরোধ করা যাবে না, এই কথাই সে মনে করে। সে শুধু চেষ্টা করে—উপকার করার আত্ম-সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে, কিন্তু কালসর্পরূপী মারী-মড়কের বিষ দাঁত ভাঙতে পারবে না। সে আরও অনেক কাজই করতে পারবে না—কাঁকর বিছানো রাস্তাটার দক্ষিণ পারের লোকেদের, মরাপুর আর দরঙিয়াল গ্রামের লোকেদের—নতুন পরিস্থিতির দ্বারা নৈতিক স্খলনে

পতিত ও মানসিক জটিলতায় আক্রান্ত এই লোকগুলোর চরিত্র সংশোধন করতে পারবে না। হঠাৎই সময় এবং ভাগ্যের জোরে প্রতিষ্ঠিত এখনকার ধনী-মানী ভোগরামকে আর পূর্বের ভোগরাম তৈরী করা যাবে না তার চেষ্টা দ্বারাও।

বাসন্তীর উপর ওর রাগ বা অভিমান কিছুই হ'ল না। বারে বারে ওর শুধু একটা কথাই মনে হ'ল যে শেষ অবধি কি ওর গাঙচিলা ছেড়ে যেতে হবে? কোন এক শীতে হয়তো দলংঘাটের উপরে কাঠের সেতু হয়ে যাবে। গড়কাপ্তানী বিভাগের রাস্তাটা এসে সোনাইর উত্তর পারের গ্রামগুলো হয়তো ছুঁয়ে যাবে। তখন হয়তো এদের জীবন-যাত্রায় আরও জটিলতা বাড়বে। ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন এই লোকগুলোকে হয়তো বা কোন কিছুই সন্তুষ্ট করতে পারবে না আর ওদের সরলতা মাখানো স্নেহ ভালবাসাও লোপ পেয়ে যাবে আস্তে আস্তে।

জীবনে যে মেয়েটিকে আপন করে নিয়েছিল, যাকে নিয়ে একটা ছোট সংসারের নীড় রচনা করবে বলে ভেবেছিল, যার মধুর স্মৃতি নিয়ে দিনটা কাটত এক আনন্দে—সেই মেয়েটি অর্থাৎ বাসন্তী যে পরের হয়ে যাবে, পরের বাড়ীতে চলে যাবে—এই চিন্তাই ওকে দিনের আলোতে তেমন অস্থির, উতলা করে তোলেনি। কিন্তু রাত হ'লে রাত্রের নিবিড় অন্ধকারে, অন্ধকার রাতের নীরবতা ভেদ করে পেঁচার বিকট চীৎকারে, জীবনের বিশৃঙ্খলতার ভয়াবহ রূপ যেন প্রকট হয়ে ওঠে আর ব্যাঙের একটানা ডাক ওকে যেন আরও অসহায় করে তুলল। সে আকাশপাতাল অনেক কিছু চিন্তা করল। বিছানাটা ওর কাছে মনে হ'ল কণ্টকশয্যা। ও ঘুমুতে না পেরে ছট্‌ফট্ করতে থাকে। কিন্তু বাসন্তী ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এমন কথা একবারও মনে হ'ল না ওর। সারা রাত ধরে যে কথাগুলো ভেবেছিল, সেগুলো ঠিক বলে মনে করল শেষ পর্যন্ত। রাত্রের চিন্তা ও দিনের চিন্তার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। অনেক সময় অন্ধকার রাত্রের অনেক চিন্তাই দিনের আলোতে

ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু ধনঞ্জয়ের কাল রাত্রের ভাবনাগুলো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। দিনের আলোতে ম্লান হবার মত নয়। সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আজকেই রূপুক বুড়ীর কাছে গিয়ে ও সব কথা বলবে। ওর হাত দিয়ে বাসন্তীকে একটা চিঠি পাঠাবে। সুযোগ বুঝে একদিন ওকে ঠাম্বুয়া ঘাট থেকে নিয়ে পালিয়ে আসবে সে।

অন্যের চোখে যাতে ধরা না পড়ে সেজন্য ধনঞ্জয় ওর বেশ পালটায়। দাড়ি কামিয়ে ফেলে এবং সুন্দর পোষাক পরে নেয়। এক এক পা করে এগোয়, রূপুক বুড়ীর বাড়ীর দিকে। শেষবারের মত নিজের মনেই প্রশ্ন করে, ওকে পালিয়ে নিয়ে এলে ওর বদনাম অপযশ হবে বা তার এই প্রশ্নের উত্তরে সে নিজেই যুক্তি খুঁজে নেয়। এই অঞ্চলে মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে যাওয়াটা একটা স্বাভাবিক কথা—তাতে পৌরুষ আছে, প্রেমের তীব্রতা আছে—আছে অজানা মাদকতা। এই অঞ্চলে তবু একটা পুরুষের অনেক নারীঘটিত ব্যাপারেই অপযশ। এখানে কোন বিধবা মায়ের একমাত্র মেয়ে পালিয়ে গেলে, কেউ নিন্দে করে না, শুধু এই বলে দুঃখ করে যে, বাড়ীতে মেয়ে না থাকলে ঘরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মেয়ে মাকে ছেড়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে গেলে বলে যে, সে তার যৌবনের ধর্ম রক্ষা করেছে। সেজন্য বিহুর সময় এ ধরণের নানা ঘটনা ঘটে থাকে। এমন ঘটনায় অযথা চাঞ্চল্য নেই, চর্চা-আলোচনা নেই। এ সোনাইপারের জোয়ারের স্রোতের মতই সময়-সাপেক্ষ ও স্বাভাবিক। ধনঞ্জয়ের দৃঢ় ধারণা যে বাসন্তীকে এরকম ভাবে নিয়ে আসার পরে তার উপর মানুষের শ্রদ্ধা কমে যাবে না। তাঁদের উপর ওর প্রভাবও কমবে না। উপরন্তু এরকম করলে ভোগরামের অহঙ্কার ও মর্যাদাবোধ খর্ব হওয়ার জন্য গ্রামের বেশ কিছু লোক খুশীই হবে। আর লোকে কি ভাববে সে কথা চিন্তা করলে কি আর নিজের মনের স্বাধীনতা থাকে? লোকে কে কি ভাববে সে কথা ভেবে নিজেকে ও নিজের মনকে সজাগ করে তুলে মানুষ কখনও সুখী হতে পারে না। এই নতুন পরিস্থিতি ওকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। সে নিজস্ব দর্শন খুঁজে পেয়েছে।

ভাবছে—কারুর আমাকে ভাল বলার দরকার নেই, কারুর প্রয়োজন নেই আমাকে শ্রদ্ধা করার। আমার বাসন্তীকে চাই। বাসন্তীকে কেন্দ্র করে যে ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে সেই ভবিষ্যতে বাধা দেবার অধিকার কারুরই নেই।

রূপুক বুড়ীর কাছে গিয়ে সব কথা বলে ধনঞ্জয়। আশ্চর্য হয় বুড়ী। বলে,—ধন বাবা, শেষ পর্যন্ত তুমিও···? সে বলে—হ্যাঁ। দিদি, আমি এরকম করতে বাধ্য হচ্ছি। তা না হলে বাসন্তী সুখী হ'তে পারবে না। আমিও পারব না।

—হ্যাঁ, হয়তো কিছুদিনের জন্য লোকে অবাক হবে। তবে লোকের কথায় আমি চলতে পারি না দিদি। তারাও একদিন সব ভুলে যাবে এবং আমিও আবার আগেকার ধনঞ্জয় হয়ে পড়ব। কিন্তু এখন যদি শ্রদ্ধা আর মান-সম্মানকে আঁকড়ে ধরে থাকি, তবে এই ভুল সারা জীবন আমাকে যন্ত্রণা দেবে। লোকে আমাকে অনেক বড় কিছু বলে ভেবে ভুল করেছে। আমার উপর ওদের উচ্চ ধারণাই আমাকে জীবন-যন্ত্রণা দিচ্ছে। মানুষ সব গুণের অধিকারী হ'তে পারে না। একমাত্র ঈশ্বরই হ'তে পারেন।

বুড়ী বিশেষ কিছু বুঝতে পারে না। শুধু বলে—তবুও একবার দেখ, ধন বাবা। আমার তো বয়স কম হয়নি। সেজন্যই ভাবছি, যদি তোমার ভুল হয়ে থাকে।

ধনঞ্জয় জোর দিয়ে বলে, আমি কখনও ভাবতে পারব না যে আমি ভুল করছি।—দিদি, একটা কথা ভেবে দেখ যে নিজের ইচ্ছার কাছে বাধা এসে গেলে তা দূর করার অধিকার মানুষের আছে। যে মেয়েটির হৃদয় আমি পেয়েছি, যে মেয়েটিকে আমি ভালবেসেছি তাকে ঘরে আনার বা তাকে বিয়ে করার অধিকার কি আমার নেই? বাসন্তীকে এভাবে নিয়ে আসা মানে তাকেও উদ্ধার করা। আমি যদি ওকে না নিয়ে আসি তাহলে কি ওকে প্রবঞ্চনা করা হবে না? মেয়েরা দুর্বল। সময়ে সময়ে ওদের মন বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। মেয়েরা বাধাবিঘ্ন ঠেকাতে অক্ষম। তারা বিপদের স্রোতে ভেসে যায়।

মনের আবেগে ধনঞ্জয় বক্তৃতা দিয়ে অনেক কিছুই বলে যায়। এতক্ষণ বাদে রূপুক বুড়ীর ধনঞ্জয়ের কথাগুলো যেন মনে লাগে। ও কোঁচকানো মুখখানায় হাসি ফুটে ওঠে। তখন মুখখানা উজ্জ্বল দেখায়। ধনঞ্জয়ের মনে হ'ল দাঁত ওঠেনি এমন একটা শিশুই যেন মিষ্টি হাসি হাসছে। সে ওকে দেখে গভীর সান্ত্বনা পায়। বুড়ী তখন ঠাট্টা করে ধনঞ্জয়কে বলে, তাইতো মেয়েদের মায়ায় জটাধারী শিবেরও মন গলে যায় আর তুমি কোন ছার। আর এই ভোগরাম হ'ল সাক্ষাৎ রুক্মবীর। যাত্রাতে রুক্মবীরের দর্প তো দেখেছই। ভগবান কৃষ্ণের তো সেজন্য রুক্মিণীকে পালিয়ে নিয়ে যেতে হ'ল।

বুড়ীর কথা শুনে ধনঞ্জয়ের আরও দুজন পুরুষ নারীর কথা মনে পড়ে যায়। ওঁরাও পুরাণের পাতায় রক্ত মাংসেরই লোক। তাঁরা হলেন উষা-অনিরুদ্ধ, সুভদ্রা-অর্জুন, নয়তো আরও কেউ।

রূপুক বুড়ী ধনঞ্জয়ের কথানুযায়ী কাজ করতে সম্মত। বুড়ীর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় ধনঞ্জয় বলে—দিদি, এখনও যদি বল যে আমার ভুল হয়েছে, তাহলে আর আমার বলার কিছু নেই। আমরা মানুষ মাত্রই ভুল ঠিক করে থাকি। ভেবে দেখ, যে রাম পিতৃসত্য পালন করে বনবাসী হ'তে পারেন, সেই রামই আবার গোপনে বালী বধ করেন। অকারণে সীতাকে বিসর্জন দেন।

বুড়ী হেসে বলে,—আমাকে আর বোঝাতে হবে না। এ যদি ভুল হয় তবে দেড় কুড়ি বছর আগে আমি কি ভুল করিনি?

ধনঞ্জয় জিজ্ঞাসা করে—একই কারণে? রূপুক বুড়ী ধনঞ্জয়ের চোখে হঠাৎ যেন যুবতী হয়ে পড়ে। বুড়ীর ঈষৎ সলজ্জ হাসিতে বয়সের দাগগুলোও মিলিয়ে যায় কোথায়। বুড়ী তখন বলে—এটা খুব গোপন কথা, কাউকে বলা যায় না। আচ্ছা ধন বাবা, কাল যেতে হবে কি?

—কাল নয় পরশু। আমি কাল এসে চিঠিখানা দিয়ে যাব। চিঠিখানা পেলে তবে বিশ্বাস করবে। খুশী মনে ধনঞ্জয় বাড়ী ফেরে।

তেরো

বর্ষাকালে দক্ষিণ পারের লোকেরা উত্তর পারে যায় না বল্লেই হয়। খুব প্রয়োজন হ'লেই তবে উত্তর পারের লোকেরা দক্ষিণ পারে যায়। কারণ এ সময় সোনাই নদী পার হওয়াতে বিপদ আছে। পাকা মাঝিরা টলমলে নৌকা নিয়ে সোনাই নদীতে ঘুরে বেড়ালেও দক্ষিণ পারে, উত্তর পারের লোক খুব কমই আসে বর্ষায়। মেয়েরা তো কখনই এসময়ে পারাপার করে না। কিন্তু রূপুক বুড়ীর কথাই আলাদা। সে বাড়ী বাড়ী মুগা আর পাটের কাপড় বিক্রী করে বেড়ায়। এটা ওর খুব ভাল ব্যবসা। এই ব্যবসা করেই বাড়ীতে দু-দুটো যুবতী মেয়েকে প্রতিপালন করছে সে। নিজেরও ভালভাবেই চলে যায়। বাড়ীতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই কিন্তু দিব্যি চলে যাচ্ছে—কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। ছোট-খাটো বিপদ-আপদকে রূপুক বুড়ী গ্রাহ্যই করে না। প্রয়োজন হ'লে টলমলে নৌকা নিয়েই নদী পার হবে। ঘাটের সব লোক, মাঝি ও নৌকার মালিকদের সবার সঙ্গেই ওর যথেষ্ট খাতির। মাঝিদের যেমন বুকের পাটা, তারও তেমনই সাহস। তাই কোন মাঝিকে অনুরোধ করলে সে ওকে দিব্যি পার করে দেয়—আপত্তি করে না। ওরাও জানে যে রূপুক বুড়ী নদীর মাছের মত কখনও জলে ডুবে মরবে না। ও খুব ভাল সাঁতার জানে। সোনাইর দুপারে ধনঞ্জয়কে যত লোক চেনে রূপুক বুড়ীকেও ঠিক তত লোকে জানে। অবশ্যি রূপুকের সঙ্গে মেয়েদের বেশী ভাব আর ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ছেলেদের।

ভর দুপুরে রূপুক বুড়ী ভোগরামের বাড়ী এসে হাজির হয়। প্রায় মাস তিনেক পরে আজ ও ভোগরামের বাড়ীতে এসেছে। এদের বাড়ীতে আসতে আজকাল ওর ভাল লাগে না। এদের হাতে পয়সা হবার পরই এদের রকম-সকম বদলে গেছে। ভোগরামও এখন অন্য রকম ভাবে কথা বলে। তাছাড়াও মুগা বা পাটের কাপড় দেখালে

এরা জর্জেট বা ভয়েলের কথা বলে। আজকে বিশেষ কাজে এলেও আগের মত আর আপনার মত করে ডাকল না। শুধু হাঁক পাড়ল—বাড়ীতে কেউ আছে ?

কোলে বাচ্চা নিয়ে ঘর থেকে তরুলতা বেরিয়ে আসে। বলে—দিদি নাকি ! আজ আমাদের বাড়ী আসার জন্য কে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিল ?

ভেতর থেকে বাসন্তী আবার বলে ওঠে—পথ ভুল করে এসেছ দেখছি রূপুক দিদি।

—তাদের যা খুশী বল আমার কিন্তু তোদের বাড়ীতে আসতে ভাল লাগে না। তোরা বড়লোক হবার পর থেকেই তোদের কেমন অন্যরকম লাগে।

কেন এমন কথা বলছ দিদি, আমরা কি কাউকে ধরে বেঁধে কিল মারছি ?

—আচ্ছা, তোরা দেখছি, লোকের কাছে বিনয় করতেও শিখেছিস !

তরুলতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—দিদি তোমাকে একটা কথা বলি শোন। কোন পরিবার বড়লোক হ'লে, পরিবারের ছেলেদেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ে। মেয়েদের কিছু হয় না।

—কি বলছিস্ ? এখনও তোর মনে দুঃখ ?

—সত্যি দিদি, আগে খাওয়া পরাতে দুঃখ কষ্ট থাকলেও মনে সুখ ছিল, এখন খাওয়া-পরার সুখ হ'লে কি হবে, মনের সুখ নেই দিদি, মনের সুখ নেই।

এতক্ষণ বাসন্তী রূপুক বুড়ীর দিকে হাঁ করে তাকিয়েছিল। ও জানে, বুড়ী থাকে গাঙচিলায়। কি জানি বুড়ী ধনঞ্জয়ের কথা তুলতে পারে হয়তো। যদি নিজের থেকে না বলে, তা হলে বৌদি চলে গেলে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়ে ধনঞ্জয়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে ও। আংটি পরার পর থেকেই খাঁচার পাখীর মত দিন কাটাচ্ছে বাসন্তী। রাত্রে নানারকম স্বপ্ন দেখছে। কত রাতে পেঁচার ডাক

শুনে আঁৎকে উঠেছে ও। জীবনের সামনে দারুণ অনিশ্চয়তা। এরই মাঝে বন্দিনীর মত জীবন কাটাচ্ছে ও। কিন্তু এখন রূপুক বুড়ীকে দেখে ওর মন এক অজানা আশার আলোয় ভরে উঠল।

তরুলতার সঙ্গে রূপুক অতি গোপনে ও অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলছে দেখে বাসন্তী নিজে থেকেই সরে দাঁড়াল। উনুনে জল চাপানো ছিল তাতে চা বানালো। এই সুযোগে বুড়ী ওকে জিজ্ঞাসা করে—তোর মনে দুঃখ কেন? ও কি তোকে মারধোর করে? শুনেছি হঠাৎ টাকা পয়সা হ'লে লোকে না কি মদ খায়?

তরুলতার চোখ দুটো ছলছল্। কানের কাছে মুখটা নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে। উনি বড়লোক হয়েছেন বটে, কিন্তু স্নেহ ভালবাসা বিসর্জন দিয়েছেন। ধন-সম্পত্তি হ'ল কিন্তু ঘাড়ে শনি চাপল। এত দিন পর আজই আমাকে অনাদর করতে আরম্ভ করলেন। এখন আমি ওর কাছে আপদ হয়েছি। ঘরের বৌয়ের কাছে এখন আর ওর মন বসে না। পরের মেয়ে বৌ'র উপর নজর। বুড়ী জিজ্ঞাসা করে—আমায় কি করতে হবে? তরুলতা বলে—গোঁসাইবরির মুকুট কৈবর্ত্ত নাকি কোমরে বাঁধবার জন্য একটা 'তাবিজ' দেয়?

—হ্যাঁ, শুনেছি।

তোমার পায়ে পড়ি দিদি, রবিবারের আগেই যেন তাবিজটা এনে দিও আমাকে। দাম যা লাগে এখনই দিচ্ছি। কি জানি হয়তো ঐ তাবিজটা ধারণ করলে তবে আমার উপরে ওঁর মন বসবে। জান তো পুরুষ মানেই ভ্রমর।

রূপুক বুড়ী তরুলতার দুঃখ বুঝতে পেরে কথা দেয়। এমন সময় বাসন্তী একবাটি চা এনে বুড়ীর সামনে রাখে। পানের বাটাটা নিয়ে এসে সুপুরী কাটতে থাকে। কথাটা ঘোরাবার জন্য তরুলতা অন্য প্রসঙ্গ পারে। বলে—দিদি, আজকাল কাপড় আন না কেন? বুড়ী সংক্ষেপে উত্তর দেয়—এই মাসেই আনিনি। লোকের অবস্থা এখন খারাপ, কিনতে পারে না।

বুড়ীকে বসতে দিয়ে তরুলতা এবারে রান্নাঘরের দিকে যায়।

বাসন্তী এবার একলা পায় বুড়ীকে। অনেকক্ষণ ধরে দুজনের মুখে কোন কথা নেই। দুজনকার চোখের দৃষ্টি বিনিময়ে অনেক কথা বোঝা পড়া হ'ল। অবশেষে বুড়ী বলে—তা' মা, দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছিস কেন? তোকে দেখে আমার বড় মায়া হচ্ছে। তুই যে চুলটাও ভাল করে বাঁধিস নি।

বাসন্তী কিছুই বলে না। দেয়ালের উপর দিয়ে যাওয়া পিঁপড়ের সারিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। রূপুক বুড়ী আবার জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা, তুই অক্ষর পড়তে পারিস তো?

বাসন্তী বলে—হ্যাঁ, চার ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছি।

—আমি সব কথাই শুনেছি বাসন্তী। ধনঞ্জয় সুখে আছে বলে ভাবিস নে। আমি আজ তোর থেকে কথা আদায় করতে এসেছি। নে, এই চিঠিখানা পড়ে ছিঁড়ে ফেল, কেউ যেন না দেখে।

বাসন্তীর চোখে বর্ষার ধারা নামে। চাদরের আঁচল দিয়ে মুখে চাপা দেয়। চোখের জল মুছে আগের চেয়ে দৃঢ় হ'ল। দু ঢোকে চা খেয়ে নিয়ে রূপুক বুড়ী অসংলগ্ন ভাবে আসল কথা উত্থাপন করে—বাসন্তী জীবনে সুযোগ একটা বড় জিনিষ। সে তোকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চায়। এই সুযোগ যদি হারাস্ তবে সারা জীবন অনুতাপ করতে হবে। বুঝেছিস্ সুযোগ জীবনে একবারই আসে।

ধনঞ্জয় যে এতদূর এগোবে বাসন্তী তা ভাবতে পারেনি। ও আনন্দে আত্মহারা হয়। বলে—কিন্তু ওঁর এত সম্মান চারদিকে! তাঁকে লোকে কত ভাল বলে জানে। বুড়ী ধমক্ দিয়ে বলে—লোকের কথায় পরোয়া করে তোরা সারা জীবন হা-হুতাশ করবি না কি? ধনঞ্জয় কি বলে জানিস? ভদ্রতা আর নিয়ম কানুন লোককে জিওল মাছের মত করে রাখে। বুঝে দেখ, বাসন্তী, প্রেম-ভালবাসা কোন নিয়ম জানে না, তখন তাদের মিলনের জন্য নিয়মবিহীন কাজ করতে হয়। এ হল বট গাছের মত বিরাট। ছোট খাটো অপযশ একে নাড়াতে পারে না। ছোট খাটো ঝড় বটগাছের পাতাকেই নাড়ায় শুধু।

রূপুক বুড়ীর কথাগুলোতে মন জুড়িয়ে যায়। বাসন্তীর প্রেম

উথলে ওঠে। ভরা বর্ষায় সোনাইর স্রোতের মত অকস্মাৎ ছন্দোময় ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। বুড়ীর সামনে যেন লজ্জা পেয়ে মুখখানা দু হাতে ঢেকে ফেলে। ছোট্ট করে 'যাব' বলে ধনঞ্জয়ের এই বিরাট কাজে সম্মতি দেয়। বুড়ীর ওকে খুব আদর করতে ইচ্ছা করে। কাছে এসে ওর এলোমেলো ছড়িয়ে পড়া চুলগুলো ঠিক করে দিয়ে বলে—রবিবারে বৌদিকে তাবিজটা দিতে এসে আরও বলব সব কথা। সেদিন রাত্রে প্রথম মুরগীর ডাকেই তুই ঠানুয়া ঘাটে পেঁাছে যাবি। সে আর ঘোগোনা মাঝি তোর জন্যে অপেক্ষা করবে সেখানে। শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না হবে, কাজেই এইটুকু রাস্তা যেতে অসুবিধে হবে না। চিঠিতে এসব কথা লেখা আছে।

বাসন্তী বলে—তুমি কিন্তু আমাদের বাড়ীতে শনিবার তাবিজ দিতে এস। রবিবারে এলে এদের সন্দেহ হতে পারে।

—আচ্ছা, তুই বলছিস যখন, তখন শনিবারেই তাবিজটা দেব। কিন্তু পাকা দেখা হয়ে যাওয়া মেয়েকে সাধারণতঃ বাড়ীর লোকেরা সন্দেহ করে না। কিন্তু একটা কথা! তোর ভাল করে মন স্থির করতে হবে। বুঝেছিস্ বাসন্তী, চাষের মাটিতে লাঙল দিতে হ'লে আর মেয়েদের ঘর ছেড়ে পালাতে হ'লে মনটাকে খুব শক্ত করা দরকার। এগুলো খুব সহজ কাজ নয়।

বাসন্তী বলতে চেয়েছিল—আমার মন একজনের জন্য সব কিছু করতে পারে, কিন্তু বলেনি লজ্জায়। রূপুক বুড়ীর তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে জেনে তরুলতাকে ডাক দিয়ে চলে যায়।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে তরুলতা বিছানায় বাসন্তী মাকে পান থেঁতো করে দিয়ে একটা কলসী নিয়ে ঘাটে গেল। ওপারে বাও ধানের মাঝে মাঝে দু একটা নৌকা চলছে বলে অনুমান করা যায়। এপারে দলংঘাটে দুখানা নৌকা আছে। ঠানুয়া ঘাট নির্জন। মাঝ রাতে চাঁদের আলোয় ভরে গেছে ঘাটটা। ব্লাউজের মধ্যে থেকে চিঠিখানা বের করে ভাঁজ খোলে। চিঠির অক্ষরগুলো দেখে মনে হ'ল এগুলো অক্ষর নয়, যেন ধনঞ্জয় কথা বলছে!

ও চুপি চুপি পড়ল :

প্রিয় বাসন্তী,

আমি জানি বাড়ীর চাপে পড়ে তোমার পাকা দেখা হ'লেও, আমি যে তোমায় ভুল বুঝেছি, একথা তুমি কখনও ভাবতে পার না। তোমার উপরে অনেক বিশ্বাস। আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি। অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম এবং শেষকালে উপায় খুঁজে পেলাম একটা—সেটা সোনাইর পারে সচরাচর ঘটেই থাকে, কিন্তু তোমাদের মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। অন্যের মতামতকে মূল্য দিয়ে চললে নিজের প্রাণের ইচ্ছাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাছাড়া সময়ও নেই এখন হাতে। কাজেই তোমাদের বাড়ীতে বা পরিবারে ঘটেনি এমনই কাজই করতে হবে শেষ পর্যন্ত। শেষ রাতে চাঁদের আলো ফুটবে। রবিবার রাত্রে ঘোগোনা মাঝিকে নিয়ে তোমাদের ঘাটে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করব। প্রথম মোরগ ডাকলেই বেরিয়ে আসবে। অবশ্যি আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক হ'লে কোন কথা নেই। আমি জানি নিজের জন্মস্থান, বুড়ী মা এবং অন্যান্য সবাইকে ছেড়ে আসতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু আমি কি পর? আর লিখব না। রূপুক বুড়ী হয়তো বলেছে সব কথা। বুড়ীর কাছে তুমি কথা দেবে বলে আগে থেকেই ধরে রেখেছি।

শেষে আমার অতি স্নেহের এবং আদরের···। তুমি ভেবে চিন্তে খালি জায়গাটা পূর্ণ করে পড়ে নিও।

ইতি—
তোমারই
ধনঞ্জয়

চিঠিখানা পড়ে বাসন্তীর মন অধীর হয়ে পড়ে। কাছের বালিমাহী সখিয়তী[1] ও গাঙচিলের আওয়াজে নতুন সুর শুনতে পায়। খরস্রোতা সোনাইর কলতান গোপন মনে আলোড়ন জাগায়। দূরের

[1] এক ধরণের পাখী।

বাওধান এবং দূর্বাবনের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মনটাও সবুজ ওঠে। সবুজ সেই পটভূমিতে নিজের রূপ দেখতে পায় বাসন্তী। সোনাইর জলে সোনা রূপো গলে গলে পড়ছে যেন। ওর বুকে জমা পাথর-গুলোও যেন গলে গলে পড়ছে এতদিনে। চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিতে বলেছে রূপুক বুড়ী, বাসন্তী কিন্তু ছিঁড়তে পারল না ধনঞ্জয়ের চিঠিখানা। এইখানাই ধনঞ্জয়ের প্রথম চিঠি। হয়তো বা এইটেই শেষ। কারণ তার সঙ্গে গেলে আর চিঠির প্রয়োজন কিসের? ধনঞ্জয়ের এই চিঠিখানা খুব আদরে যত্নে গোপনে রেখে দেবে বাসন্তী। ওর সঙ্গে যাওয়ার পরেও। কেননা একদিন সে গৃহিনী হবে, দু তিন সন্তানেরও জননী হবে হয়তো। ওর যৌবন বিদায় নেওয়ার প্রাক মুহূর্তে হয়তো সযত্নে রাখা এই চিঠিখানা বাসন্তী তাকে দেখিয়ে বলবে—দেখ তো তুমি আমাকে কি সুন্দর চিঠি লিখেছিলে। আমি তোমার মনে কেমন সাড়া জাগিয়েছিলাম। তার হয়তো তখন ওকে আরও ভাল লেগে যাবে। সে পিতার গাম্ভীর্য ও স্বামীর দায়িত্ব মিশিয়ে বলবে—পাগলী মেয়ে। তুমি দেখছি দিন দিন ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ। এই বলে হয়তো প্রাণ খুলে হাসবে।

কলসীতে জল ভর্তি করে বাড়ী ফিরল বাসন্তী। ওর মাথার বালিশটার সেলাই খুলে দিয়ে তুলোর মাঝখানে ও চিঠিখানা রাখে এবং আগের মত করেই চিহ্ন না রেখে সেলাই করে। কেউ টের পায় না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওর নিজের বাড়ীটা ওর কাছে যেন পরের বাড়ী মনে হতে লাগল।

রবিবার দিন বিকেল থেকেই মায়ের সঙ্গে খুবই মিষ্টি করে কথা বলল বাসন্তী। ওর বৌদি কিছু টের পাবে বলে ও দূরে দূরেই থাকে। কখন সে দিনটা পার হয় তার প্রতীক্ষায় থাকল। ভোগরাম আজ সারাদিন বাড়ীতে নেই। রাত্রে আসতে পারে। ওর স্বভাব চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। যখন থেকে ওর টাকা-পয়সা হয়েছে তখন থেকেই ও যুবতী মেয়ে যে বাড়ীতে আছে সেখানে যাতায়াত সুরু করে। চলপুরীয়ার একটা বৌ-এর সঙ্গেও ওর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে

উঠেছে। মেয়েটিকে সে পয়সা দেয়—একথা অনেকেই জানে। তরুলতাও জানে। আজকাল তরুলতার মনে বড়ই দুঃখ। ছেলে-মেয়েদের মুখ চেয়েই ওর সান্ত্বনা। বাসন্তী ভাবল, ও আজ চলে গেলে তরুলতা বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে যাবে। দুঃখের বোঝা হাল্‌কা করার জন্য মনের কথা বলার মত আর কাউকে পাবে না।

রাত্রে বাসন্তী ভাত খেতে পারে না। ওর মনে অসংখ্য চিন্তা। যদি ধরা পড়ে যায়। দিনের বেলাতেই ও একটা পোঁটলা বেঁধে ঘরের এক কোনে রেখে দিয়েছে যাতে কেউ দেখতে না পায়। সেই পোঁটলাতে ধনঞ্জয়ের চিঠিখানা লুকিয়ে রাখা বালিশটাও আছে। অবশ্যি সেই বালিশটার মধ্যে ওর সোনার গয়নাগুলোও আছে। কারণ বাড়ীতে থাকার সময় ভাল গয়না পরা যায় না—সবার চোখে পড়বে। তা ছাড়া গয়নাগুলো সঙ্গে না নিয়ে গেলে ধনঞ্জয় তো তাড়াতাড়ি গড়িয়েও দিতে পারবে না হয়তো। ওর টাকা-পয়সাই বা কত আছে? কি জানি হয়তো আছে ওর কিছু। কালকে রূপুক বুড়ী এসে বলেছিল যে ধনঞ্জয় যেন ওর বাড়ীর আরও দুটো ঘর বাড়িয়েছে। ইস্‌ ওরও যে ইচ্ছে! ওকে রাজরানী করে না রাখলে আর হচ্ছে না।

খাবার সময় ভোগরাম প্রায়ই থাকে না। বাসন্তীরা শোবার সময় দরজায় ধাক্কা দেয়। আজকেও সে রাত দশটায় এসে হাজির। ওর গলা শুনেই আজ বাসন্তীর বড় রাগ হল। যে লোকটাকে ধনঞ্জয় সাধারণ লোক বলে ভাবে আর ঘৃণা করে, সেই লোকটাকে বাসন্তীর ঘৃণা করা উচিত। ওর দাদার উপর প্রতিশোধের ভাব হল। ধনঞ্জয়ের কাছে পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা প্রবল হ'ল। এই বাড়ীর মায়া কাটিয়ে যাওয়ার জন্য মনটাকে শক্ত করতে থাকে। ও ভেবে নিল—পালিয়ে যাওয়া মানেই সম্মানলোভী ভোগরামকে অপমান করা আর তার উপরে প্রতিশোধ নেওয়া। এ ভাবেই সে শিক্ষা পাবে আর বুঝতে পারবে যে যুবতী মেয়েদেরও মন বলে একটা পদার্থ আছে। ওদের নিজেদের ইচ্ছা অনিচ্ছা আছে আর ওরাও প্রচলিত নীতিকে উপেক্ষা করে সুখী হবার পথ খুঁজে নিতে পারে।

রাত্রে মেঘ মেঘ হয়েছে দেখে ওর মনটা দমে গেল। ধনঞ্জয় কি আসবে না নৌকা নিয়ে? নিশ্চয় আসবে। শেষ রাত্রেও যদি আবহাওয়া এ রকমই থাকে তাহলেও ঘোর অন্ধকার হবে না। রাস্তাঘাট অন্তত দেখা যাবে। তাছাড়া ফুটফুটে জ্যোৎস্না ভাল নয়।

ভোগরাম তখন গভীর ঘুমে অচেতন। তরুলতাও ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। কারণ ঘরে আলো নেই। বাসন্তী মায়ের সঙ্গে শুয়ে আছে। মায়ের আবার ভাল ঘুম হয় না রাত্রে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি ঘোষা থেকে পদ গুন্‌গুন্ করতে থাকেন—'মোকে কৃপা কর হরি এ, দান্তে ধরো তৃণ তুমি কৃপাময়ক নেজানা অত দিন।' তখন মাঝ রাত, মায়ের ঘুম আসছে না। বাসন্তী আজ দরজায় ছিটকিনি আটকায় নি। প্রথমে শোবার সময়ে শব্দ করে ছিটকিনি আটকায়; কিন্তু একটু পরে বাইরে যাওয়ার অজুহাতে দরজা খোলে এবং পুনরায় যখন ঘরে ঢোকে তখন আর ছিট্‌কিনি আটকায় নি। দরজা বন্ধ করার শব্দ হলেও খিল দিল না।

আজকে কি মোরগ ডাকবে না নাকি? কেন ডাকবে না? ও বোকা বলেই ও-সব যা-তা ভাবছে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন হয় না। মোরগ, ডাউক, সখিয়তী, বালিমাহী পাখী এমন কি গিরগিটিও প্রকৃতিরই অংশ। এরাও চন্দ্র সূর্য তারার মতই। এরা সব কাজই ঠিক সময় মতই করে। আজকেও তোলন কছারীর বাড়ীর মুরগী-গুলো ডাকবে—কোক্কর কো, কুউ-উ-উ।

গোয়ালের বাছুর একটা হাম্বা হাম্বা করছে। এটাও কি শেষ রাতের চিহ্ন। কাজলী গাই চার মাসের বাছুরটা এত সুন্দর—এত ভাল লাগে ওকে। ও উঠানে দাঁড়ালে ছুটে চলে এসে বাসন্তীর কাপড় শুকতে থাকে। হাতের তেলো চাটে। অন্য জায়গায় গিয়ে গাঙচিলার কথা যেমন মনে পড়বে তেমন এই গরুটার কথাও মনে পড়বে। উপায় নেই। মায়া আর প্রেম দুটো এক জিনিষ নয় তো? এই বড় প্রশ্নটা বাসন্তীকে অস্থির করে তোলে।

এই সব ভাবলে চলবে না। ওর মন ঠিক করার সময় হচ্ছে এই

মুহূর্ত। ঐ যে উইচিংড়িগুলো চিঁ চিঁ করছে। মোরগ ডাকেনি যদিও রাত শেষ হবার উপক্রম। বাসন্তী রাস্তায় গাড়ীর চাকায় কাঁকরের শব্দ শুনেছে। তাহলে সোন্দর খামারের লোকেরা গাড়ী নিয়ে সহরে গেল। নিশ্চয় মাঝ রাত হয়ে গেছে কারণ এখন তাদের দেখে লোকেরা রাত কত হয়েছে ঠিক করে। ও দুটো নাম-না-জানা পাখীর ডাকও শুনতে পায়। নীলুদের কুকুরও ঘেউ ঘেউ করছে। দোনামুখীর জঙ্গল থেকে হায়নার ডাক ওর কানে আসছে। ওর বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। অজানা আশঙ্কায় ওর মন শঙ্কিত। সত্যি তো একজনের সঙ্গে পালিয়ে যেতে হলে সাহস চাই, মনোবল চাই এবং চাই অন্ধ নিষ্ঠুরতাও।

মা, দাদা, বৌদি ও ছোট ছোট ভাইপো ভাইঝিদের জন্যে এই মুহূর্তে ওর বড় মায়া হয়। ওদের বড় বেশী আপনার মনে হচ্ছে। ওদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ওর রক্তের সম্পর্ক। ওদের প্রতি ওর বিশেষ টান আছে। ওরা হয়তো ওদের এই বয়সে প্রেমের মূল্য বুঝতে পারবে না, কিন্তু ওর কিছু ভাল হলে কি ওরা খুশী হবে না? ওর দাদা ভোগরামকে কি বাসন্তীর খারাপ লাগে? মাও আজকাল ওর বড় বড় গরম গরম কথা শুনে দুঃখ করেন। কিন্তু এই দাদাকে ও কেন খারাপ বলবে, বাবা মারা যাবার পর দাদা না থাকলে তো সংসারটা ভেসে যেত? এখনকার মত জরির কাজ করা মেখেলা ও ভয়েলের চাদর পরা তো দূরের কথা, ওকে পরের বাড়ীতে কাজ করতে যেতে হ'ত। টাকা পয়সা কার চাই না, কার প্রয়োজন নেই? যারা টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারে না তারাই টাকা পয়সা অসার একথা বলে বলে বেড়ায়।

কাল সকালে বৌদি ওকে দেখতে না পেয়ে মুষড়ে পড়বে। হয়তো চীৎকার করে কাঁদবে। কাঁদার পর যতই বাসন্তীর প্রতি ওর স্নেহ থাকুক না কেন, বাসন্তীকে গালাগাল করবে। কিন্তু তরুলতাকে বাসন্তীর বড়ই ভালো লাগে। যৌবনকালে তরুলতাই বাসন্তীর সুখ দুঃখের সাথী ছিল। অন্যের কাছে বাসন্তীর গুণের কথা বলে তরুলতার যে কি গর্ব।

এই তো মা—যেন কাঠের মত পড়ে আছেন বিছানায়। এই মা কত মহীয়সী। দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে কত কষ্টই না পেয়েছেন তিনি। কি জানি এখনও ওকে কেন্দ্র করে কতই না স্বপ্ন রচনা করছেন তিনি। মেয়েকে দেখে হয়তো নিজের যৌবনের ছবি দেখছেন আর কত না মধুর স্মৃতি ওর মনে ঘোরাফেরা করছে।

ওর মনটা যে মুহূর্তের মধ্যে বড়ই নরম হয়ে গেল। বাড়ীটা যেন একটা পবিত্র মন্দির বলে মনে হচ্ছে ওর। বাড়ীর সবাইকেই ওর খুব ভাল লাগছে এখন। ওদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা উপছে পড়ছে। ওর জন্মভিটেটাও এই নির্জন রাত্রে যেন মুখর হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ ওর গা থেকে মাথা পর্যন্ত সারা শরীরে যেন একটা শিহরণ খেলে গেল। তোলন কছারীর বাড়ী থেকে মোরগের ডাক শোনা গেল। সময় হয়েছে। এই মুহূর্তেই ওর মন ঠিক করতে হবে। ওর জীবনের পরম ক্ষণ এসেছে। রূপুক বুড়ীর কথাগুলো ওর কানে বাজছে—মনটাকে শক্ত করে বাঁধতে হয়। ধনঞ্জয়ও সেরকম একটা আভাস দিয়েছে: 'আমি জানি জন্মস্থান ছেড়ে আসতে, বৃদ্ধা মা এবং অন্যান্য সবাইকে ছেড়ে আসতে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু আমি কি পর?'

চিঠিটার এই কয়েক লাইন কথাই আবার ওকে মনোবল যোগায়। বাঁদিকের বগলের নীচে পোঁটলাটা নিয়ে নেয়। আরেক হাত দিয়ে ঘুমন্ত মায়ের পা ছুঁয়ে মাকে প্রণাম করে। মাত্র একটা বছর কষ্ট হবে। পরে যখন কোলে বাচ্চা নিয়ে ঘরে ঢুকব তখন মায়ের আনন্দের শেষ থাকবে না।

চুপিসাড়ে ঘর থেকে বেরুল বাসন্তী। দরজা আস্তে করে বন্ধ করে দিল। গাছের পাতা নড়ার শব্দটিও হ'ল না। পোঁটলাটা মাটিতে রেখে ভিটেটাকে একবার প্রণাম করে নেয়। একটু মাটি ওর সিঁথিতে লেপে দিল। মনে মনেই বলে—হে গৃহলক্ষ্মী, তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

তুলসী গাছ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে শুঁকলো। ছুটো

পাতা বুকের মধ্যে নিয়ে নেয়। একবার ওপরের দিকে তাকায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের চার পাশে মেঘ নেই। চাঁদ যেন ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

পিছন দিকের সব্জীবাগানের শেষেই ঠান্নুয়া ঘাট। ঘাটের দিকে ও এক পা এক পা করে এগোতে থাকে। ওকে উত্তর ও দক্ষিণ—দুটো শক্তিই পরস্পর বিপরীত দিকে টানছে। তবুও আস্তে আস্তে শরীরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ও ঘাটের দিকে। চাঁদের আলোয় দেখা যায় সুপুরী গাছের থোকে কাঠবেড়ালী নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। গাগিনী পাখী কাঁঠাল গাছে মিষ্টি শব্দ করছে। এগিয়ে যাচ্ছে বাসন্তী। কাঠঠোকরা পাখীটা কিছুক্ষণ নীরব। হয়তো বা দেখছে ওকেই। দলংঘাট থেকে ভেসে আসছে বড়গীতের সুর। হয়তো কোন ভক্ত মাঝি গাইছে—"বাঁছুরি গৌরী গোপাল প্রাণ নেহারি ফোকারয় শ্বাস, নয়নে জুরে নীর, বয়নে পুরিত বারি।"......

ঘাটে পৌছতে আর মাত্র দু হাত। বাঁশগাছের ঝাড় ঘাটটাকে ঢেকে রেখেছে। কালোজামের গাছ দুটোর ফাঁক দিয়ে ওর গায়ে চাঁদের আলো ঠিক্‌রে পড়ছে। ঘাটের দিকে আর ওর পা এগোচ্ছে না। চোখের জল দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে বাসন্তী।

বাসন্তী আরও কয়েক পা এগোয়। বাঁশের ঝাড়টা পার হয়। সোনাই নদী চোখে পড়ে। নৌকার একটা দিক চোখে পড়ে। অন্য দিকটা আজার* গাছে ঢেকে ফেলেছে। নৌকার উপরে সাদা কাপড় পরা একটা মূর্তি চোখে পড়ে। নিশ্চয়ই সে ধনঞ্জয়। আরেকটা লোককে দেখতে না পেলেও জ্বলন্ত বিড়ির আগুন দেখতে পেল। বিড়ি খাওয়া লোকটা নিশ্চয়ই ঘোগোনা মাঝি?

হঠাৎ ওর নতুন চেতনার উদ্রেক হয়। হাতের আংটিটা চোখে পড়ে। আংটিটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বাসন্তী। মথুরার

*এক প্রকার গাছ

মা ওকে আংটি পরিয়ে দেন আর নিজের মেয়ের মত মনে করেন। বাসন্তীকে আংটি পরিয়ে বলেছিলেন তিনি—আর দু দিন বাদে আমরা কি তোমার আপনার হব না? মনের মধ্যে কত আশা নিয়ে তিনি ওকে পুত্রবধূ করতে চেয়েছেন। আংটির পাথরগুলো চাঁদের আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছে। অচেনা সেই মথুরা নামে ছেলেটির আশা-আকাঙ্ক্ষা যেন জ্বলজ্বল করছে ওর চোখের সামনে। আজ কালকে সেই অজানা অচেনা লোকটার কি অপমান হবে না এর ফলে? দাদা ভোগরাম তো কাল থেকেই চার পাঁচটা গ্রামে মুখ দেখাতে পারবে না। আর ও পালিয়ে গেছে শুনে ঐ দুঃখে মা যদি মারা যান? কালকে যদি 'তোমারই চক্রান্তে এ রকম ঘটল' বলে ভোগরাম তরুলতাকে মারধোর করে?

নৌকা থেকে ওরা দেখতে পাবে বলে কাঁঠাল গাছ একটায় ঠেস দিয়ে ও পিছন ফিরে দাঁড়ায়। আংটিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলবে বলে ভেবেও পারল না। এরকম করলে পাপ হবে। ও হিন্দুর মেয়ে। ঈশ্বরকে সাক্ষী করে ওকে আংটি পরানো হয়েছে। সেদিনই সে পান সুপুরী দিয়ে সাজানো বাটার সামনে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেছিল। প্রণাম মানেই ভগবানকে প্রণাম করা। সেদিন থেকে ধর্মের নীতি নিয়ম অনুযায়ী বাসন্তী আরেকটা পরিবারের হয়ে গেছে। সেই পুরুষটিকে ও ফাঁকি দিতে পারে না। আর এখন পর্যন্ত ধনঞ্জয় ওর শরীরটাকে অপবিত্র করতে পারেনি। ও এখনও পবিত্র কুমারী।

এই নৈতিক চেতনা একটু পরেই বেশী প্রবল হয়ে ওঠে আর কোন দিকে না তাকিয়ে বাড়ীর দিকে ফিরে। দরজার কাছে এসে পৌঁছায়। আস্তে করে দরজাটা খুলে পোঁটলাটা এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে। ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দেয়। মা হয়তো সাড়া পেলেন! মেয়ে বাইরে গেছে ভেবে আর সাড়া দিলেন না। ও বিছানায় শুয়ে পড়ে। ওর সারা শরীরে জ্বরের ঘাম দিয়েছে এখন।

একটু পরে দ্বিতীয় বার মোরগ ডাকে। বাসন্তী ভাবে, ওরা

নিশ্চয়ই নৌকা করে এতক্ষণে গাঙচিলায় পৌঁছে গেছে। এত অপমানিত হওয়ার পরও ঘোগোনা মাঝিকে হয়তো ধনঞ্জয় ওর নামে কিছুই বলেনি। এই চিন্তা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওর ঠোঁট দুটো গাছের পাতার মত কাঁপতে থাকে। ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে বাসন্তী। সাড়া পেয়ে মা শুধোন—কি হল তোর বাসন্তী। ও কাঁদ কাঁদ গলায় বলে—মা তোমার কথা ভেবেই খারাপ লাগছে। আমি যখন পরের বাড়ীতে চলে যাবো, তখন তুমি তো চারদিকে শূন্য দেখবে আর আমারও যে তখন ভীষণ খারাপ লাগবে।

মা ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন—বোকা মেয়ে এই জন্যে এত কাঁদতে হয়। আমি ভাবলাম, তোর কিছু অসুখ-বিসুখ হ'ল না তো? আইবুড়ো মেয়ের কি শুধু মায়ের মন দেখলেই চলে মা? এই সামান্য কথাটাও তুই বুঝলি না।

চৌদ্দ

সেদিন থেকেই বাসন্তীর মন বিয়ের জন্য প্রস্তুত হ'ল। দিনগুলো পার হয়ে যায়। অবশেষে একদিন বিয়ের দিন এসে গেল। তখনই কেবল বাসন্তী মথুরার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে। ওর সব খোঁজ খবর নেয়। ওর বৌদি এবং মা ওকে মধ্যে মধ্যে উপদেশ দেন, কি করে পরের বাড়ীতে চলতে হয় ইত্যাদি—।

গায়ে হলুদ অথবা জোরণের দিন বরপক্ষের দেওয়া কাপড় অলঙ্কারাদি পরে বাসন্তী আরেকটা সংসারের মঙ্গল চিন্তা করতে থাকে। মথুরার দিকে ওর মন দেওয়ার চেষ্টা করে। অনেকদিন আগে মা যে কথাটা বলেছিলেন, সেটাই জীবনের পাথেয় করে নিল বাসন্তী। আসলে মা বলেছিলেন—মেয়েরা ভাল হ'লে যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই সুখে সংসার করতে পারে। মেয়েরা যে

কোনো অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেই সুখী হ'তে পারে।

হোমের আগুনের কাছে এলে সাধারণত কনের একটু কান্না পায়। আশেপাশে মেয়েদেরও চোখ ছলছল করে। সে সময়ে কাঁদছিল বাসন্তী। তরুলতা ও ওর মা সুজলার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বরের কাছে বাসন্তীকে বসিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও একটা আলদা মেয়ে হয়ে পড়ে। ওর চাদরের কোনার সঙ্গে মথুরার চাদরের কোনায় গেরো বেঁধে দেওয়া হয়। ও মথুরার সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করে তখন। বিয়ের মন্ত্র ওকে নতুন জীবনের সন্ধান দেয়। বাসন্তীর কুমারী জীবন চিরকালের জন্য শেষ হয়ে যায়। ওর মাথার সিঁদুর ও ঘোমটা ওর যে বিয়ে হয়েছে তা পরিচয় দেয়।

বর যখন বাসর ঘরে ঢোকে তখন মা জামাইকে উপদেশ দিতেছেন শুনে বাসন্তী আশ্চর্য হয়ে যায়। নিজের ছেলের মতনই এই প্রথম পরের ছেলেকে মা উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু অকপট ভক্তিতে সেও মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। সুজলাও তার মাথায় হাত দিয়ে অন্তর উজাড় করে আশীর্বাদ করেছেন। একদিনের মধ্যেই এই দুই পরিবার স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

হোমের কাছে বসার সময় বাসন্তী কেবল মথুরার উপস্থিতিটাই অনুভব করেছিল। বুক অবধি ঢাকা ওরনাটা না থাকলে ও লোকের সামনে মথুরার দিকে তাকাতেই পারত না। মথুরার কি ওকে দেখতে ইচ্ছে করছিল না? ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ও ওর হাত আর পা'ই দেখতে পেয়েছিল শুধু। একবার এক ঝলকে মুখখানা দেখলেও ওর চেহারা সম্পর্কে কোন অনুমান করতে পারেনি তখন।

কিন্তু এখন ভিতরে এসে ঘোমটাটা ছোট করে নেওয়ার দরুন ওকে ভাল করে দেখে নেওয়ার সুযোগ পেল। মথুরা দেখতে বেশ সুন্দর। মুখের মধ্যে কেমন যেন এক পবিত্রতা ও কৌমার্যের ছাপ আছে। প্রথম দর্শনেই ওকে খুবই আপন মনে হ'ল বাসন্তীর। ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা। ওর সুঠাম দেহটা যে কর্মঠ তা সহজেই বোঝা

যায়। সোয়ালকুছির* পাটের পাঞ্জাবীর গলার বোতামটা খোলা আছে বলে চওড়া বুকটা আরও সুগঠিত লাগছে। অকস্মাৎ বাসন্তীর একটা কথা মনে পড়ে যায়। যে সব পুরুষের বুকে লোম থাকে তারা খুবই কোমল স্বভাবের হয়। তাই মথুরার স্বভাবও কোমল স্বভাবেরই হবে নিশ্চয়। বাসন্তী ভাবে।

শ্বশুর বাড়ী যাবার আগে বাসন্তী দাদাকে প্রণাম করার সময় ওর চোখ থেকে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়ে মাটিতে। এই চোখের জল দুঃখের নয়—দাদার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় ওর মনটা উদার হয়ে পড়ে। ও অনেক ভেবেচিন্তে এই কথা বুঝেছে যে পৃথিবীতে মানুষ ভাল-মন্দের সমষ্টি। পৃথিবীটাই ভাল খারাপ নিয়েই তৈরী। তবুও পৃথিবীটা সুন্দর, মনোমুগ্ধকারী ও চির নতুন।

অনেককে কাঁদিয়ে কাটিয়ে ও নিজে কেঁদে কেটে বাসন্তী পাল্কীতে চড়ে বরের বাঁদিকে বসে। নতুন পথের সন্ধানে বাসন্তী এগিয়ে চলে দরঙিয়াল গ্রামের দিকে। ঘোড়া টানা পাল্কী থেকে বাসন্তী নিজের গ্রামের দিকে তাকায়। চোখের দৃষ্টির বাইরে গ্রামটা চলে গেলেও বৌদি, মা, ভাইপো-ভাইঝিকে ওর খুবই মনে পড়তে থাকে। মা আর বৌদি হয়তো বা ওর কথাই ভাবছে সজল চোখে। ভাইপোরা হয়তো কাঁদছে ওর জন্য। দাদা হয়তো কাউকে বলছে—আজকের থেকে ঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল।

পাল্কীর পিছনে আসছে হেঁটে হেঁটে বরযাত্রী। তাদের আনন্দের রোল ওর কানে এলেও বাড়ী ছেড়ে চলে আসার বেদনা যেন আরও তীব্রতর হ'ল।

হঠাৎ ও ককিয়ে কেঁদে ওঠে। মথুরা তা শুনতে পায়। সে ওর পিঠে হাত দেয়। বাসন্তী শিহরণ অনুভব করে। আগে যাকে

---

*সোয়ালকুছি—আসামে কামরূপ জেলার একটি স্থান। এখনকার পাট রেশম খুবই বিখ্যাত।

কখনও দেখেনি, এমন যে পুরুষটি ওর গায়ে হাত দিয়েছে, এটা তার বৈধ অধিকার। সে বলে,—কেঁদ না। আমারও তো খারাপ লাগে। ওর গলাটা মিষ্টি। বাসন্তীর হৃদয় জুড়িয়ে যায়। হ্যাঁ, এই পুরুষই আমায় স্নেহ ভালবাসা দিতে পারবে। এমন ভাবে সে প্রবোধ না দিলে ওর অন্তরটাই শূন্য হয়ে যেত। পুরুষের একটু মিষ্টি কথাতেই অনেক দুঃখ হাল্‌কা হয়ে যায়। একটা যাত্রার কথা ওর মনে পড়ে। রাজকুমারী রুক্মিণীকে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ প্রবোধ দিয়েছিলেন। পীতবস্ত্রে 'আঁখি-মুখ' মুছে বলেছিলেন—"কি করব সিংহক শূকরসব আয়া। হামাকু শপত তাপ তেজহু জায়া।"

ম'রাপুরের দু'মাইল পূর্ব দিকে দরগুয়াল গ্রামে বাসন্তী আগে দিন দুই ছিল। এই গ্রামটাও ঠিক ম'রাপুরের মতনই। মাত্র সোনাই নদীটা এখানে বেঁকে গেছে। মথুরার ঘরের সামনেই সোনাই। কারণ বাড়ীটা উত্তরমুখী।

বাসি বিয়ের দিনই বাসন্তীর শাশুড়ী, শ্বশুর ও ননদদের বেশ আপনার মনে হয়েছিল। দুটি ননদ,—পারুল আর পুতুলী! ভারী আমুদে মেয়ে। সেদিন অনেকগুলো ছেলেমেয়ে বেশ ঠাট্টা মস্করা করে বর-কনেকে নিয়ে। অনেক রাত হয়ে গেল। বাসন্তীর খুব ভাল লাগল। গ্রামবাসীদের পছন্দ হয়েছে বাসন্তীকে। কেউ বলেছে, মেয়েটির লক্ষণ ভাল। দেখতেও প্রতিমার মত। কেউ বলেছে, ভগীরথ দাদা, আপনার ছেলের কপাল খুবই ভাল। পাড়ার কোন মহিলা শাশুড়ীকে এসে বলেছে, ছেলেতে মেয়েতে মানিয়েছে ভাল। হাঁসের মত লম্বা গলাওয়ালা মেয়ে যে বাড়ীতে আসে, তাদের চারদিকে জয় জয়কার—একথাও বলেছে অনেকে। আড়াল থেকে এই সব কথা শুনে বাসন্তী গর্বে ফুলে ওঠে। ওর আত্মবিশ্বাস জাগে। রূপ আর স্নেহ দিয়ে পুরুষকে সহজে বশ করা যায় বলে ওর মনে হয়।

আজকের রাতটাই জীবনের অন্যান্য রাতগুলোর চেয়ে বিশেষত্বপূর্ণ। এমন একটা রাত সবারই চিরকাল মনে থাকে। এমন একটা

রাতকেই তো যুবক-যুবতীর আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং স্নেহ-বাসনায় পূর্ণ করার জন্য সমাজ স্বীকৃতি দেয়।

প্রশস্ত তিনটে জানালাযুক্ত ঘরে বিছানাটা যে কে এমন করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে, বাসন্তী তা বুঝতে পারে না। ঘরের মধ্যে থেকে অগরু চন্দনের গন্ধে মন অনুরাগের জোয়ার ভেসে যায়। পুতুলী, পারুল আর পাশের বাড়ীর একটি বৌ বাসন্তীকে জোর করে ঠেলে দেয় এই ঘরে। তখন যা লজ্জা করছিল বাসন্তীর! মথুরাও এমন ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে ঘরে ঢুকলে ওর কেমন লাগবে? লুকিয়ে চুরিয়েও ওর মুখের দিকে তাকাতে পারবে না। ওর তরুলতাকে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে এখন! ওর জীবনে—অনেকের জীবনেই এমন একটা দিন এসেছিল। এমন একটা দিনেই, এমন দিনের কল্পনাতেই যুবতীর চোখে যুবক হয়ে পড়ে দেবতা।

জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে। বাইরে জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার আলোতে কচু, ঢেকীয়া শাকের জটাগুলো মনে হচ্ছে যেন রজনীগন্ধার জটা। কয়েক হাত দূরে বয়ে যাওয়া সোনাই নদীটি যেন সোনাই নয়—যেন রাতের যমুনা। বিকশিত বৃন্দাবনে প্রাণের যমুনা। হ্যাঁ, তাই তো ওর কুমারীত্ব হারিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তটাতে এমন ভাবে ভাবাই ভাল। এমন ভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়াটাই বুদ্ধিমতীর কাজ। ধনঞ্জয়ের কথা ওর মনে এলেও সেই স্মৃতি, ধূসর, অস্পষ্ট ও স্থিতিহীন। সে সময়ের স্রোতে শাপলার মত সীমান্তে মিলে যাবে।

হঠাৎ ওর চিন্তার স্রোতে বাধা পড়ে। আস্তে আস্তে কাঁচুমাচু হয়ে ঘরে ঢোকে মথুরা। দরজাটা বন্ধ করে দেয়। লম্ফর ফিতেটা বাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থাকে। একবার বাসন্তীর দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীটার পকেট থেকে কাগজ দুটো আর ফাউন্টেন পেনটা বের করে টুলের উপর রাখে। একবার চুলে হাত বোলায়। জানালার পর্দার উপর দিয়ে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে, মথুরা সেই আলোর দিকে তাকাল।

তরুলতা যে ভাবে শিখিয়ে দিয়েছিল বাসন্তী সেই ভাবে পানের বাটাটা মথুরার পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে। সে বলে—এসো, বস। ভয় সংকোচ ছেড়ে দিয়ে ওর কাছে এসে বসে বাসন্তী। ওর আঙুলগুলো নাড়তে নাড়তে বলে—তোমার বাড়ীর কথা মনে পড়ছে, তাই না?

—না তো?

—আমাকে তোমার ভয় করছে?

—উঁ হুঁ।

কিন্তু বাসন্তীর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। স্বরটা গলায় আটকে যাচ্ছে। তবুও ওর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে। ওকে যেন মথুরা ইন্দ্রজালে বশ করেছে। মথুরা তখন ঘোমটাটা সরিয়ে ওর মুখের দিকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকায়। সেই চাহনিতে লালসার দৃষ্টি নেই আছে স্নেহের পরশ।

—তোমাকে বাড়ীতে এই নামেই ডাকে? মথুরা বুদ্ধিমান। একটা প্রশ্ন খুঁজে পায়।

—হ্যাঁ। আমার বাড়ীতে আলাদা কোন নাম নেই।

—এই নামটা কে দিয়েছিল?

—পিসী।

—আমার কিন্তু দুটো নাম।

—কি কি?

গ্রামে মথুরা। বাইরে মনধন মণ্ডল। সরকারের বাড়ীতে আমার নাম মনধন। আমার কিন্তু এই নামটাই ভাল লাগে। মথুরা হচ্ছে জায়গার নাম। এই নামটা আবার মানুষেরও হয়ে গেছে! বলে নিজে নিজেই হো হো করে হাসে।

—আমি যদি 'ধন' বলে ডাকি, খারাপ লাগবে না?

—না না ভালো লাগবে।

ওর মুখে মথুরা হাত বুলিয়ে দেয়। সঙ্কোচে মুখখানা সরিয়ে নেয় বাসন্তী। মথুরার চোখে যেন বাসন্তী একটি ভাস্কর্য।

—তুমি খুব সুন্দর, ভারী সুন্দর।

—সত্যি ?

—হ্যাঁ সত্যি, আমাদের বিয়েটা যেমন সত্যি, এও ঠিক তেমনই সত্যি। না না ভুল করেছি। সুন্দর হওয়াটা ঘটনার মধ্যে পড়ে না। হ্যাঁ আমি যা বলেছি, মানে তুমি খুব সুন্দর—চন্দ্র সূর্যের মতই সত্যি।

—একেবারে উকিলের জোরালো যুক্তি।

—এই কথার জোরেই তো রোজগার করছি। কথার বাহাদুরীতেই সবাইকে ভুলিয়ে রাখি।

—কথাগুলো একেবারে·········

—আচ্ছা আমি লোকটা কি রকম দেখতে ?

—খুবই সুন্দর। বাবুর মত চেহারা।

—ইস্ তা নয়। চাল কুমড়োর মত—চারদিকে সমান।

—কে বলেছে ?

—আমিই।

—বললেই হ'ল ?

—এসব কথা এমন ভাবে না বললে, তোমার হাসি পাবে কেন ?

—তা বলে নিজেকে খারাপ বলতে হয় না কি ?

—মজা লাগছে।

ওদের হাসির রেশ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ওর মুখ থেকে মথুরার হাত দুটো আস্তে আস্তে নেমে আসে। রাত্রের নিবিড় অন্ধকারে মথুরা বাসন্তীকে বুকের কাছে টেনে নেয়। প্রথমে ওর খুবই অদ্ভুত লাগে। শরীরে রক্তের স্রোত উদ্দাম হয়ে উঠলেও এত তাড়াতাড়ি কি করে ও আত্মসমর্পন করবে তাই ভাবতে থাকে। যেন একটা বড় রকমের ব্যতিক্রম। কিন্তু তার যে অধিকার আছে—আছে বাসন্তীরও।

বাসন্তী নিজের মুখ ঢাকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখে কাঠের একটা তক্তায় দু গেলাস দুধ। শাশুড়ীর নির্দেশ অনুযায়ী পারুল

রেখেছিল। তা হলে আজকের রাত্রিতে প্রত্যেকেরই এক গেলাস করে দুধ খেতে হবে। রাত্রে নতুন ধরণের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করতে সবাই তা হলে এরকম ভাবে দুধ খায়? তা হলে কি অন্তরের গোপন ইচ্ছা এবং সলজ্জ রাত্রের ইংগিত কি একেবারেই নৈতিক সম্মতি লাভ করে? এও তো চন্দ্র সূর্যের মত ধ্রুব সত্য!

ছোট ছোট নিশ্বাস টেনে সে বলে,—ধন, লম্ফটা। মুখে মুখ লাগিয়ে সে শুধায়—লম্ফটা কি? ও লজ্জা বিসর্জন দিয়ে বলে—লজ্জা করছে। লম্ফটা যদি।...

লম্ফটা নিভিয়ে দেয় মথুরা। জানালা দিয়ে চাঁদের মৃদু আলো এসে ঘরের অন্ধকারকে একটু হালকা করে। সেই অন্ধকারে ওদের লজ্জা সংকোচ দূর হ'ল। নতুন অনুভূতির স্বাদ নিতে গিয়ে এই সংস্কারশুদ্ধ মন দুটি উদগ্র কামনার মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। একটি দেহ আরেকটি দেহের দিকে সরীসৃপ গতিতে এগিয়ে চলে। তৃপ্তি সন্ধানী দুটি দেহের একক রূপান্তরে রাত্রের অন্ধকার ও নীরবতায় বেশী গোপন ও মোহনীয় হয়ে ওঠে। রাতের জ্যোৎস্না সকালের সূর্যের রক্তাভায় লালচে হয়ে ওঠে। দুটি দেহ—পুরুষ আর প্রকৃতির সৃষ্টির ইন্দ্রজাল তরঙ্গের একটি ছন্দ, একটি রাগ—দেহে দেহে বিলীন হওয়ার সনাতন উদগ্র কামনার……।

পনের

সংসারটাকে সুন্দর ও আনন্দমুখর করে তোলে বাসন্তী। ননদ পুতুলী ও পারুল ওদের বৌদিকে ছাড়তেই চায় না। বৌয়ের আদর যত্ন পেয়ে শাশুড়ী ভণিতা ও শ্বশুর ভগীরথ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিয়ের আগে মথুরা অনেক রাত অবধি গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে তাস খেলে বেড়াত। এখন সন্ধ্যে হ'লেই বাড়ী ফেরে। অষ্টমঙ্গলার পরে

একদিন বোনেদের সঙ্গে বাসন্তীকে সহরে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যায় মথুরা। বিয়ের প্রথম মাসে ওরা দুজনে খুব ঘোরে। বেবেজিয়ায় মাসীর বাড়ীতে নতুন বৌ নিয়ে যায়। তারপর মাগুরাগাওঁ, রূপহী, ভালুকমারী, কপাহেরা ও বহাতেও যায়। বহাতে একটা সার্কাস পার্টি এসেছিল। মথুরার খুব গর্ব। ওর বৌয়ের রূপের প্রশংসা শুনতে পায় চারদিক থেকে। ওদের বন্ধু হাসান মণ্ডলের মা'ও বলেছিলেন—তোর বৌকে দেখে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল, মনধন। তোদের দুজনকে দেখলে মনে হয় যেন এক জোড়া চাতক-চাতকী সোনাইয়ের পারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিয়ের পর বাসন্তীর মা এসেছিলেন। ওদের ঘর-দোর দেখে সুজলার খুব ভাল লাগে। সঙ্গে তরুলতাও এসেছিল। সহরে যাবার সময় ভোগরাম এদের বাড়ী হয়ে যায়। বাসন্তীর মনে সুখ। চারদিক সুখে ভরে যাচ্ছে সব কিছু। কিন্তু একটা কথায় ওর মনটা খারাপ হয়ে যায়। একদিন বৌদির কাছে শোনে যে, ভোগরাম ওর আগের অবৈধ সম্পর্ক ছেদ করতে পারেনি। ব্যাপারটা আজ-কাল সুজলাও জানতে পেরেছে। সেই দুঃখে আরও অসুখ বেড়ে গেছে বুড়ীর। কাসতে কাসতে দম আটকে যায়, রাত্রে ঘুমুতে পারে না। সহর থেকে ভোগরাম ডাক্তারী ওষুধ এনে দেয়। কিন্তু ওর উপর রাগ করে ওষুধ মোটে ছোঁয় না সুজলা। বলেন—আমার জন্য তোরা এত চিন্তা করিস কেন? মরণের দিন এলে ওষুধে কি কাজ করবে? ভোগরামের আনা ওষুধ খাব না। ঘরে পাপ ঢুকেছে তরু। আর সইতে পারছি না, ঈশ্বর আমাকে পার করলেই বেঁচে যাই।

ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে যেসব বয়স্ক লোকেদের তাঁরা মরতে চাইলে ভগবান তাঁদের টেনে নেন। এমন দৃষ্টান্ত কয়েকটা দেখেছে বাসন্তী। ও ভাবে দরঙিয়ালে থাকতে ওর হাতের জল না পেয়ে যদি মা মারা যান, তবে সেই দুঃখ আর রাখতে পারবে না কোনদিন। একদিন মথুরাকে কেঁদে কেঁদে কথাটা বলে ফেলে। মথুরা শুধু বলে—এইসব

ভেবে মনকে কষ্ট দিচ্ছ কেন শুধু শুধু ? ভাগ্যে থাকলে ঠিকই নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। মায়ের উপর ভক্তি আছে যখন, তখন মাকে আসল সময়ে পাবেই। বাসন্তী সান্ত্বনা পায়।

বিয়ের মাত্র তিন মাস হয়েছে, এমন সময় বাসন্তীর জীবনে এল এক ঘূর্ণি ঝড়। একদিন গ্রামের একটি দোকানের সামনে বেশ কিছু লোক জড় হয়ে কি যেন আলোচনা করছিল খুব আগ্রহের সঙ্গে। মথুরা গিয়ে হাজির হ'ল সেখানে। সেও ভীড়ের মধ্যে দাঁড়াল। ওর উপস্থিতি কেউ টের পেল না। আলোচনা চলতে থাকে। কথাটা হচ্ছে, আগের দিন রাত্রিবেলা চলপুরীয়ার লোকেরা ভোগরামকে বেঁধে রেখেছিল। পুলিশের ভয়ে পরে ছেড়ে দেয় ওকে। চলপুরীয়ার একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ের সঙ্গে তাকে ওরা হাতে-নাতে ধরে ফেলে।

কোন ধনী লোকের চরিত্রদোষের ইংগিত পেলে সেই বিষয়টা লোকের কাছে ভারী মুখরোচক হয়ে ওঠে। পরচর্চাকারী মেয়ে-মহলেও এইসব গল্প করার জন্য পান খাওয়ার ধুম পড়ে যায় তখন। মথুরা লোকের ভীড়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার ভিতর থেকেই একজন বলে ওঠে – হ্যাঁ, বিষয় সম্পত্তি মানেই চণ্ডাল। দুটো পয়সা হাতে পেয়েই তার মাটিতে পা পড়তে চায় না। মগজে পাপ ঢুকলে আর রক্ষে আছে! নতুন বড়লোকের বাড়ীর মেয়েটাকেই বা কি বিশ্বাস ? ওর বোনটা, আমাদের মথুরার বৌ, সেও কি কম ? গাঙচিলার সেই ওষুধ দিয়ে বেড়ান লোকটার সঙ্গে ও কি কম বাড়াবাড়ি করেছিল ? ও নাকি রাত্রে পালিয়ে যাচ্ছিল ওর সঙ্গে। এই কথা শুনে একজন জিজ্ঞাসা করে—ও দধি দাদা, তুমি এসব খবর কি করে জানলে ? লোকটা বলল—যতদিন সোনাইর পারের মাঝি আর দোকানীরা বেঁচে থাকবে, ততদিন খবর জানবার জন্য গুপ্তচরের অভাব নেই……।

মথুরার আর কথা শোনার ধৈর্য থাকে না। সে সকলের অলক্ষ্যে ভীড় থেকে চট করে গা ঢাকা দেয়। বাড়ীতে এসেই সে অদ্ভুত ধরণের ব্যবহার শুরু করে। সে কর্কশ গলায় বাসন্তীকে বলে—দাদার কীর্তি শুনেছ ?

—কি হ'ল ?

বড়লোকের ব্যাটা যে ঢলপুরীয়াতে ধরা পড়েছিল হাতে-নাতে। এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পারত। মেয়েদের মেখেলাটা* তার মাথায় পরানো উচিত ছিল।

—খুলে বলছ না কেন, কি হয়েছে কি ?

—কি আবার হবে ? লম্পট দাদাকে ঢলপুরীয়াতে বেঁধে রেখেছে।

সব কথা বুঝতে পারে বাসন্তী। এখন ওর প্রিয় বৌদির না জানি কি অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও ওর দুঃখ হল মথুরার ব্যবহারে। সে কখনও তার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলে না। আজকে ওর নানা যুক্তি দিয়ে বাসন্তীকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত ছিল। দাদার বদনাম কোন বোনই বা সহ্য করতে পারে ? মথুরা হঠাৎ এত নিষ্ঠুর হয়ে গেল কেন ?

সেদিন থেকেই মথুরা একেবারে অন্য লোক। ধনঞ্জয়কে সেও চেনে। সেজন্য তার গায়ের জ্বালা ধরে। দরঙিয়াল গ্রামের কলীয়া কেরাণীর বাড়ীর সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য আছে। এর দুদিন বাদেই কলীয়ার ছেলে ঘনকান্ত চম্পাকের বাড়ীর বড় সভাতে মথুরাকে খারাপ ইঙ্গিত দিয়ে হেনস্তা করে। সকলে ঘনকান্তের কথাতেই সায় দেয়।

আস্তে আস্তে মথুরার মনে এই কথাটা বেশ গভীর ভাবে দাগ কাটে। সে বাসন্তীকে তার কিছু আভাস না দিলেও, তার কথা এবং কাজে বাসন্তী এক অজানা বিপদের সূচনা দেখতে পায়। আজকাল সে আবার রাত্রে দেরী করে বাড়ী ফিরতে শুরু করে যেমন করত বিয়ের আগে। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কি এক চিন্তায় মগ্ন। রাত্রে বাসন্তীর দিকে পিছন ফেরে শোয়। পুতুলী আর পারুল ঝগড়া করলে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে মথুরা। কাজে কর্মে ওর মনে নেই। পোষাক-আশাকেও যত্ন নেয় না আজকাল।

*মেখেলা—মেয়েদের পোষাক।

পেন্সনধারী লোকের মত অপরিপাটী, অবিন্যস্ত হয়ে থাকে। বাসন্তীর অনুরোধ আর ইচ্ছাকে আমল দেয় না ও আজকাল। ওর নরম স্বভাব খুব অল্প দিনের মধ্যেই উগ্র হয়ে উঠল। কথায় কথায় ও রেগে যায়, বিরক্ত হয়। বাসন্তী যদি বলে—'একটা জামা কতদিন পরে থাকবে? ওটা ছেড়ে আরেকটা পর'। তখন সেই জামাটা ছুঁড়ে দিয়ে বলে—আর অত আদর দেখাতে হবে না। আমি যাই পরি না কেন, তোমার তাতে কি?

—আজকাল মথুরা খেতে বসেই উঠে পড়ে। আর দুটি ভাত খাও, নইলে বল পাবে কি করে? বাসন্তী একদিন বলে ফেলে।

—থাক্ হয়েছে। আর ডাক্তারণীর বক্তৃতা দিতে হবে না। তুমি সুখে থাক, খেয়ে-দেয়ে তাগড়া হও। উত্তর দেয় মথুরা।

—দুপুরে এত রোদে কোথায় বেরুচ্ছ? তোমাকে তো সারা-দিনটাই আমি পাইনে। বাসন্তী একদিন মরিয়া হয়ে বলে ফেলে।

—তুমি আমার উপর কিসের এক্তিয়ার খাটাতে এসেছ? এখন থেকে কি তোমার হুকুম নিয়ে আমায় বেরুতে হবে নাকি?

মথুরার কথাগুলো যেমন রূঢ়, গলার স্বরও তেমনি কর্কশ। মথুরার এই ধরণের ব্যবহার নীরবে সহ্য করে বাসন্তী এবং হাজার চেষ্টা করেও ও মথুরাকে আর আগের মত করতে পারল না। কত রাত বাসন্তী কেঁদে কেঁদে কাটায়, তবুও মথুরা একবার জিজ্ঞাসা করে না—কি হয়েছে? একদিন বাসন্তী বেশ জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। পাশের ঘর থেকে পুতুলী ও পারুল শুনতে পায়, কিন্তু কেউ আসেনি ওকে জিজ্ঞাসা করতে। শ্বশুর এবং শাশুড়ী দুজনেই শুনেছিলেন ওর কান্না। কিন্তু শুনেও না শোনার ভান করেছিলেন। কারণ স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার আদি-অন্ত নেই, হেতু-অহেতু নেই। ওদের কারণ বোঝা শক্ত। এইটে সবাই জানে যে, স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে পর মুহূর্তে তাদের আবার মিল হয়ে যায়। কিন্তু বাসন্তীর এই করুণ কান্নাতে মথুরার পাষাণ মন গলল না। সে ধমক দিয়ে ওঠে, শুতেও একটু দেবে না কি আমাকে? কি পেত্নীর মত কাঁদছ? ওর কান্না তখন আরও

বেড়ে যায়, অন্তরের সকল বেদনা ঢেলে বলে—আমি কি অন্যায় করেছি? আমাকে বল, দোহাই তোমার। তুমি যা চাও আমি তাই করব, আমাকে এইটুকু সুযোগ দাও শুধু। আমাকে দুঃখ দিতে তোমার কি এত ভাল লাগে? মথুরা কিছু বলে না। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। সে বাইরে উঠে গিয়ে বিড়ি খাচ্ছিল। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘরে ঢুকে নিজের মনেই বলছিল—আমার মনে যেসব কথা আছে, সেগুলো বলার পর তোমার সঙ্গে আমার আর ঘর করা চলে না। মেয়েরা পুরুষদের বোকা মনে করে। কিন্তু অতি চালাকের যে গলায় দড়ি সেটা জানে না।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাসন্তীর মাথা ঘোরে, কান দুটো ভোঁ ভোঁ করে। বাসন্তীর শরীর অবশ হয়ে যায়। গা দিয়ে জ্বরের ঘাম ঝরে। মুখে শব্দটি নেই। ও আর মথুরাকে বিশেষ করে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করল না। দুর্ভাগ্য হয়তো ওর পথের সাথী। একজনকে অনেক কষ্টে পরিত্যাগ করে আরেক জনের সঙ্গে শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু যে কারণে ওর বিবাহিত জীবনে সংকট ঘনিয়ে আসতে পারে সেই কারণটা যাতে না ঘটে তার জন্য এতদিন ও ভগবানকে প্রার্থনা করে আসছিল। শেষে তাইই ঘটল। বাসন্তী ভাবে, ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ওর যে কিছুটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল আর যৌবনের ধর্ম অনুযায়ী সে ওর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল, এই সহজ কথাটা বলে দিলে মথুরা মনের সব সন্দেহ আর জটিলতা ত্যাগ করতে পারবে? ও কেঁদে কেটে ওর কাছে সত্যি কথাটাই বলবে। মাথার চুল ছিঁড়ে কাকুতি-মিনতি করে ওর ক্ষমা ভিক্ষে চাইবে। মথুরা খুবই ভাল মানুষ। এই ক'মাসের মধ্যেই ওকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে বাসন্তী। তাছাড়া সেও বাসন্তীকে সত্যিই ভালবাসে।

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে-কথা বলতে পারল না বাসন্তী। দারুণ বিপদের আশঙ্কায় ওর কণ্ঠরোধ হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সে মাথায় একটু জল দিয়ে আসে। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে। স্বামীর প্রশস্ত নরম বিছানাটা ওকে যেন কাঁটা ফোটাতে থাকে।

কয়েকদিনের মাথায় ম'রাপুরের একজন লোক ভগীরথ কানুনগোর বাড়ীতে এসে খবর দেয়, বাসন্তীর মায়ের শক্ত অসুখ। ইনজেকশান দেওয়া হচ্ছে। রাত জেগে রুগীকে সেবা করতে হচ্ছে। সুজলার মেয়ে-জামাইকে দেখার খুব ইচ্ছে।

এই কথা শুনে বাসন্তী অস্থির হয়ে পড়ে। ভণিতা এবং ভগীরথ ছেলেকে কড়া আদেশ দেন বাসন্তীকে মায়ের কাছে নিয়ে যেতে। মথুরা কিন্তু অচল, অটল। আমার বৌকে নেওয়া না নেওয়াটা আমার ব্যাপার। অন্যের তাতে বলার কি আছে? শেষে ও মা বাবার কথাও গ্রাহ্য করছে না। কুটুম্বের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায় বলে ভগীরথ কানুনগো নিজেই সুজলাকে দেখতে যান আর সেদিন সন্ধ্যেবেলাই ফিরে এসে খবর দেন রোগীর এক সঙ্গে অনেক-গুলো অসুখ। ইনজেকশান দিয়ে একটু ভালো আছে। ভণিতা জিজ্ঞাসা করে—এরা না যাওয়ার কারণ কি বললে?

ভগীরত বলে—আমি বলেছি, মথুরা এই কয় দিন সহরে আছে। আমি নিজে গাড়ীর সুবিধে করতে পারলাম না।

এই কথা শুনে বাসন্তীর মনটা একটু শান্ত হ'লেও মথুরার উপর তাঁর আক্রোশ হল। স্বামী হ'ল বলেই কি ওকে এত অত্যাচার করবে? অসুস্থ মাকে দেখতে যেতে না দেওয়াটা শুধু অত্যাচারই নয় পাশবিক নিষ্ঠুরতাও বটে। রাত্রে ও আগের মত না কাঁদলেও ঘুমুতে পারল না। সকালে উঠে সোজাসুজি ও মথুরাকে বলল—আমি যদিও বা কিছু দোষ করে থাকি, বৌদি কি করল? তুমি কি আমায় কেনা গোলাম পেয়েছে? মথুরাও সমান দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয়—আমি তোমাকে ধরে বেঁধে রাখিনি তো? চলে যাও। এখানে আর না এলেও চলবে।

—তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন?

—হ্যাঁ, আমার ভুল হয়েছে।

—তুমি আমাকে কিছু একটা সন্দেহ করছ যা দেখছি।

—সন্দেহ করার দরকার নেই, কান দুখানা থাকলেই হয়।

এই কথাটা মথুরা অন্তর থেকেই বলে। হঠাৎ ওর কাছে খোলাখুলি ভাবে বলতে চাইল মথুরা সবকিছু। ওর মুখে বিচারকের ইস্পাত কঠিন গাম্ভীর্য।

বাসন্তী বলে—অন্যের রঙ মাখানো কথা শোনার চেয়ে আমার নিজের মুখ থেকেই শোন তবে।

মথুরা একবার চকিতে ওর মুখের দিকে তাকায় এবং সেইভাবে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কি জানি বাসন্তী সত্যি কথা বলবে কি না, তা ওর মুখ নিরূপণ করতে চাইল। বাসন্তীর প্রতি মথুরার দয়াও হ'ল। ওকে বলার অনুমতি দিল।

বাসন্তী মথুরাকে নিজের অসহায় জীবনের একমাত্র আশ্রয় জ্ঞান করে অন্তরের সকল আবেগ ঠেলে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ওর কি ধরণের সম্পর্ক ছিল এবং সেই সম্পর্কের দরুণ তার একটুও শুচিতা নষ্ট হয়নি এবং কেমন ভাবে সেই সম্পর্ক বেড়ে গিয়ে আবার অন্তর্হিত হয় সবই ওর কাছে বলল। কিন্তু ঠানুয়া ঘাটে ওর বুকের মধ্যে মাথা রাখার কথা এবং রাত্রে ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে মনস্থ করেও পালিয়ে যায়নি—সে ব্যাপারটা চেপে গেল। কথা শেষ করে অনেকক্ষণ কাঁদল বাসন্তী। মথুরার হাত ধরে বলল, বল, আমায় ক্ষমা করেছ? এবার তো তোমার সব সন্দেহ দূর হয়েছে?

মথুরা পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল। চোখ দুটো ছলছল্ করে ওর। গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেছে। কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাসন্তী বুঝতে পারে যে সে আগের চেয়ে বেশী হতাশ হয়েছে। শোবার ঘরের মেঝেতে অবশ হয়ে শুয়ে পড়ে বাসন্তী।

উঠোনে সাইকেলটা টেনে নিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাসন্তী দেখে, মথুরা তার কাঁধে কামিজটা নিয়ে আখের গাছে সাইকেলটাকে ঠেস্ দিয়ে রেখে তাতে হাওয়া দিচ্ছে।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করে—চা-টা না খেয়ে সকালে কোথায় যাচ্ছ ?

অন্য দিকে তাকিয়ে মথুরা উত্তর দেয়—অনেকটা দূরে। আমার সরকারী অফিসে অনেক কাজ আছে।

—কিন্তু দোহাই আমার, আজকে যেও না। আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি আজ।

—হোঃ, সরকার তোমার স্বপ্নের কথা শুনবে কি ? ওর কথায় কান না দিয়ে মথুরা সাইকেলে চড়ে বসে। বাসন্তীর আর বুঝতে বাকী থাকে না যে বিনা কাজেই সে বেরিয়েছে।

পচা মালের দোকানের সামনে চারজন লোক ছিল। কি ? কোন দিকে যাচ্ছ ? ওদের এইসব প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে সোজা রাস্তায় গেল মথুরা। লোকগুলো বলাবলি করতে থাকে—কদিনের মধ্যেই লোকটা কি রকম যেন হয়ে গেল ? ও বোধ হয় সব কথা টের পেয়েছে। সব কথা শুনে সে কি শান্তিতে থাকতে পারে ?

—হ্যাঁ, তাইতো ওর মনে আগুন জ্বলছে। অমন মানুষটা কি হয়ে গেল। দাড়ি কামায় না, চুল আঁচড়ায় না, কারুর সঙ্গে কথা বলে না। শুনেছি, ও আজকাল সাব ডেপুটির অফিসে পর্যন্ত হাজিরা দিতে যায় না।···

কাঁকর বাঁধানো পাকা রাস্তায় মথুরা গেল। ওর গায়ে যেন আগুন জ্বলছে আজ। নানা ধরণের চিন্তাতে ও বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছে। এতদিন পরের কথা ও বিশ্বাস করেনি। বাসন্তীর সঙ্গে খারাপ ব্যবহরে করলেও মনের অন্তরালে ওর প্রতি স্নেহ লুকানো ছিল। এখনও ওর প্রতি স্নেহ আছে বলে আরও অসহায় বোধ করছে ও। বাসন্তীই ওর জীবনে প্রথম নারী। কিন্তু ওর নিজের মুখের কথা পরের কাছ থেকে শোনা কথার সঙ্গে মিলে যাওয়াতে ও আরও বেশী ভেঙ্গে পড়েছে। সে ভাবল—নিশ্চয় বাসন্তী ধনঞ্জয়কে ওর দেহমনের সকল সুধা বিলিয়ে দিয়েছে। মেয়ে হয়ে এতটা বলতে পারে না। ও কি ছলনা করতে পারে ? সুন্দর হওয়ার জন্যই ও

ছলনাময়ী হয়েছে। মথুরা উভয়সংকটে পড়েছে। সে এক ভয়ানক জটিল আবর্তে ঘুরছে। তা হলে কি ওর প্রেম, আকাংক্ষা, আশা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিনা দোষে ব্যর্থ হ'তে চলেছে? বারে বারে ওর মনে হচ্ছে—ওর নিজের মুখ থেকে শোনা কথা বিশ্বাস করতেই হবে। এর চেয়ে বেশী কিছু ঘটতে পারে, কিন্তু কম কিছু হতে পারে না। সে পুরুষ হয়ে, স্বামী হয়ে কি করে সহ্য করবে এসব ?···

আজকে বড় রাস্তায় অনেক মোটর-বাস। দলংঘাটে আজ হাটের দিন। ভেনেট, ডিজেল ট্রাক আর জীপ গাড়ী ঘনঘন যাতায়াত করছে। এত ধুলো যে রাস্তা দেখা যায় না। সে বাজারের দিকে এসেছে। দলংঘাটের বাজারে আজ ধনঞ্জয়ের সঙ্গে ওর দেখা করার ইচ্ছা। কিন্তু ধনঞ্জয়কে পেল না সেখানে। গাঙচিলাতে সরকারের একটা বাঁধ করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন অবধি কিছু হ'ল না। এই জন্য ধনঞ্জয় গেছে শিলঙে।

দুপুরে সে বাড়ীর দিকে ফিরছিল। বাড়ী ফেরার সময় ওর মনে আরও বেশী অশান্তি। কোন সুখের আশায় সে আজ ঘরে যাবে ? সে বড়ই উদাসীন হয়ে পড়ে। পুরাণো স্মৃতিগুলো ওর মনে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট।

কাঁকর বিছানো পাকা রাস্তা দিয়ে মাইল খানেক আসতেই বাজারের দিকে বাসগুলো ঘন ঘন আসতে লাগল। তখন বাজার ভাঙার সময়। বাস মোটর আসা যাওয়া করলেও ও আর সতর্ক হতে পারছে না। এমন কি মোটর গাড়ীগুলো ধোঁয়া ও ধুলো উড়িয়ে ওর মুখ সাদা করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে বা মুখ চাপা দিতেও সে ভুলে গেছে। মোটরের হর্ন আর শব্দও ওর কানে আসছে না। ও যেন ধ্যানযোগী। পরম নিস্তব্ধতা ওর ধ্যানধারণাকে তীব্র করেছে। ও পথ চলার নিয়ম অনুযায়ী সাইকেল না চালানোর দরুণ কোন কোন মোটর গাড়ীর চালকের অসুবিধেও হচ্ছে। মোটর রেখে তারা ওকে গালাগালিও দিচ্ছে। মথুরার সে সব কানেও যাচ্ছে না। সে কোথায় গিয়েছিল, কেন

যাচ্ছে—এসব কথা যেন কিছুই ভাবতে পারছে না। ওর শুধু একটা চিন্তা। এই চিন্তার কোন সমাধান নেই। যতই এই চিন্তা বাড়ছে ততই পরিস্থিতির জটিলতা বাড়ছে।

অবশেষে যা ঘটবার তাই হ'ল। কিছুক্ষণ আগে একটা ডিজেল ট্রাক যাচ্ছিল ধুলা উড়িয়ে। ও কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। জি, এম, সি, ট্রাকটা খুব জোরে আসছিল, ব্রেক কষেও নিরাপদ দূরত্বে গাড়ী থামাতে পারল না। সাইকেল নিয়ে মথুরা ট্রাকের নীচে পড়ে। ট্রাকটা একটু দূরে ছিল। ড্রাইভার নেমে এসে দেখে, তিন বর্গমিটার জায়গা জুড়ে ধুলো। লোকটা এমনভাবে জখম হয়েছে যে চেনাও যায় না। মাথাটা থেতলে গেছে। কী বীভৎস দৃশ্য! চাপা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়েছে। সাইকেলটারও কোন চিহ্ন নেই।

হঠাৎ ব্রেক কষাটা হচ্ছে দুর্ঘটনার চিহ্ন। প্রচণ্ড শব্দ হয়েছিল। আশেপাশের লোক দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এইসব দেখে ড্রাইভারের খুব ভয় হয়। মৃত ব্যক্তিকে দেখে ওর ভীষণ দুঃখ হ'ল। ঘটনার বীভৎসতায় ওকে চেতনাহীন করে দিয়েছিল। লোকগুলোকে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এল। গ্রামের লোক এমনিতে ছাড়বে না। ওকে মেরে টুকরো টুকরো করবে। তাই একটুও দেরী না করে পুরোদমে ট্রাক চালিয়ে পালিয়ে যায় ও। তার মনে দুঃখ হলেও মৃত লোকটাকে এভাবে ফেলে পালিয়ে আসার জন্য ওর অনুশোচনা হল না। যে মারা গেছে, সে তো গেছেই। যে বেঁচে আছে তাকে তো বাঁচতে হবে।

দুর্ঘটনাস্থলে তখন অনেক লোকের হৈ চৈ। দু একটা বাস মোটর দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করতে থাকে। মৃতদেহ সনাক্ত করাই কঠিন। বাঁ হাতটা ট্রাকের তলায় চাপা পড়েনি। হাতের ফেবার-লিউবা ঘড়িটা চলছে তখনও। সার্টের হাতা আর ঘড়ি বাঁধা হাত দেখে মথুরা হ'তে পারে বলে দু-একজন অভিমত দেয়। অনেকে এই বিকট দৃশ্য দেখে চোখ বন্ধ করে সরে যায়।

পুলিশ এল। দুর্ঘটনার জায়গাটা তারা ভাল করে দেখে নেয়। ডান হাতের একটা টুকরোয় আংটি পাওয়া গেল একটা। মৃত ব্যক্তিকে নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করার সুযোগ মিলল একটা। কিন্তু ওকে যে গাড়ীটা চাপা দিয়ে পালিয়েছে তাকে ধরতে পারা গ্রাম্য পুলিশের সাধ্য নয়।

বাতাসের মত চারদিকে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। ম'রাপুরের থেকে ভোগরাম এল। আর পুলিশের দেখানো আংটিটা সে চিনে ফেলে। সহরে পোস্টমর্টেম হয়ে যাওয়ার পর মথুরার মৃতদেহকে বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। বাসন্তী পাগলের মত মৃতদেহের ওপর কেঁদে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ে অচেতন হয়ে যায়। বাড়ীর সবার একই অবস্থা। বাসন্তী সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকতে এক বৃদ্ধা ওর মাথার সিঁদুর মুছে দেয়। হাতের চুড়ি ও কানের দুলও খুলে নেয়।

শবদাহের সময় মথুরার বন্ধু মিনাধর ধরা গলায় বলে—দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে বলে আমার মন বলে না। এক নতুন উপায়ে বন্ধু আত্মহত্যা করেছে। বুঝলে মরুমণি দাদা, আমি আমার বন্ধুকে ভাল করেই চিনি। কেন এ কাজ করল তা অবশ্য আমায় বলেনি। ভাবছি, বন্ধু কত মহৎ। নিজে মরল, কিন্তু আত্মহত্যার অপযশ থেকে সংসারকে বাঁচিয়ে গেল। নিজে মরব বলেই যখন ঠিক করেছে, তখন অপরকে জানিয়ে লাভ কি? ওর বেঁচে থাকার ইচ্ছাই ছিল না।

কথাগুলো বলে মিনাধর গামছা দিয়ে নিজের মুখ ঢাকে। তার চোখ দুটো জলে ভরে যায়। এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে সেখান সরে আসে। হয়তো বা একলা ভেবে ভেবে নিজেকে কষ্ট দেবে বেশী।

মিনাধর কথাগুলো আস্তে করে বললেও দু একজন ওর কথা শুনেছিল, কিন্তু কেউ তাতে বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। এই শোচনীয় ঘটনায় ভগীরথের পরিবারের প্রতি সকলেরই সহানুভূতি হল। কুৎসা রটনা বন্ধ হল। আর মৃত ব্যক্তি তো মহান হ'লই।

ষোল

ভগীরথ এবং ভণিতা উভয়েই বাসন্তীকে খুব স্নেহের চোখে দেখতে লাগলেন। ভরা-যৌবনে-উপচে-পড়া এই মেয়েটির এমন অবস্থা দেখে যাতে ও কোন কথাতেই দুঃখ না পায় বা ভেঙ্গে না পড়ে তার জন্য বুড়ো বুড়ী খুবই সতর্ক। তা ছাড়া সংসারের হালটা বাসন্তী শক্ত হাতে ধরেছিল বলেই তা টিকে রইল। পুত্রবধূর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো-বুড়ী ছেলের শোক ভুলতে চাইলেন। শ্রাদ্ধ-কর্ম চুকে যাওয়ার পর বাসন্তী মায়ের কাছে গেল। যাবার আগে ভগীরথ বললেন—মা, তুমি যদি সেখানে থাকতে চাও, তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি দুঃখ পাব না। বাসন্তী কথা দেয়—বাবা, মায়ের বাড়ীতে আমার কোন স্বত্ব নেই, কি নিয়ে আমি সেখানে থাকব?

বৌ-এর কথায় ভগীরথ খুশী হল। ভণিতা বলেছিলেন বাসন্তী এখন অন্তঃসত্বা—সাড়ে চার মাস চলছে। নাতির মুখ দেখার আশায় ভগীরথ কানুনগো দিন গুনতে থাকেন। একটা নাতি হ'লে তবুও এই পরিবারে মথুরার চিহ্ন থাকবে।

ভণিতার সঙ্গে বাড়ী গিয়ে বাসন্তী চার দিন মায়ের কাছে থাকল। ভোগরাম ও তরুলতা ওকে ম'রাপুরে থাকার জন্য অনেক করে বলে। ওদের সহানুভূতিপূর্ণ অনুরোধ বাসন্তী রক্ষা করতে পারল না। বিনীত-ভাবে জানাল ওর মনের অভিপ্রায়; তারপর শাশুড়ীর সঙ্গে আবার ফিরে আসে দরডিয়াল গ্রামে।

মায়ের অবস্থা খারাপের দিকেই। পুরানো অসুখ বলেই হঠাৎ মারা যাননি। বাসন্তী চলে আসার সময় মা বলেছিলেন—যা, মা তুই ওখানে থাকতে চেয়েছিস্ বলে আমি খুব খুশী হয়েছি। শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের মা-বাবা বলে মনে করবি। আমি আর কদিন আছি? এই দুঃখ পুষে রেখে আমার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই। মাঝে মাঝে চলে আসিস্ মা।

মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাসন্তী বিদায় নেয়। ভোগরামও মনের দুঃখে একটা কথাও বলতে পারে না বাসন্তীর সঙ্গে। মাথায় হাত দিয়ে বসে বাসন্তীর চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখতে লাগল নীরবে। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই দীর্ঘশ্বাস আশেপাশের বাতাসকেও ভারী করে তুলেছিল। দাদার প্রতি ওর আগের মতই স্নেহ। হয়তো ভোগরাম আজকাল ভাল হয়ে গেছে। ঢলপুরীয়ার সেই মেয়েটার সঙ্গে ওর যা বদনাম ছিল—এখন তা চাপা পড়ে গেছে। ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে সোনাইর পারের মোহনীর প্রকৃতি ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সোনাই-পারের জীবন যাত্রায় দুঃখ-ভরা, কলঙ্ক-ভরা, এবং এমন কি মৃত্যুর মুখোমুখি আগত ভয়াবহ অতীতকেও সবাই ভুলতে বসেছে। সোনাইপারের মানুষেরা উদার হয়, প্রসন্ন হয়। তারা চাষ করে, কৃষ্ণকে পূজো করে। সোনাইর স্রোত নিত্য-নতুন ধারায় বয়। সোনাইর অজানা অভিপ্রায়ও নিত্য-নতুন। সোনাইপারের লোকেরাও নিত্য-নতুন। এই নতুনত্বই আবহমানকালব্যাপী। নতুন গতি চেতনাই ভোগরামের অপযশ, অনেকের সমাজ স্বীকৃত কলঙ্ক ভোগরামের পূর্ব ইতিহাস আর বাসন্তীর জ্বালা-যন্ত্রণা ঢেকে দেয়।

কিন্তু প্রকৃতির এই রূপ ও চারদিকের গতির স্পন্দনে কোন নতুন আশা বা আলো দেখতে পায় না বাসন্তী। ওর মনে শুধু একটিই আশা—সন্তান লাভ করার চিরকালের আশা! কিন্তু বাসন্তী তো জন্মদুঃখী, দুর্ভাগ্যই তার পথের সাথী। সে কি ভবিষ্যতে সুদিনের আশা করতে পারে?

বাড়ীর সবার কাছ থেকেই বাসন্তী আশাতীত আনন্দ লাভ করেছে। পুতুলী আর পারুল ওকে যতটা পারে আনন্দে রাখার চেষ্টা করে। বৃদ্ধ শ্বশুর সর্বদাই খোঁজ খবর নেন, বাসন্তী কি খেতে ভালবাসে। শাশুড়ীর ওকে নিয়ে না শুলে ভাল লাগে না—শান্তি পায় না। রাত্রে বুড়ী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে কীর্তন গুণমালা গায়।

কিন্তু বাসন্তী কিছুতে শান্তি পায় না। একটা কথায় ওর মন বড়ই পীড়িত। বাসন্তী ভাবে নিশ্চয়ই ওর দোষেই মথুরা প্রাণ হারাল। যুগ যুগ ধরে নিহিত সোনাইপারের দর্শন ও যে জানে না তা নয়। মাও ওকে কুমারী অবস্থাতেই এই দর্শন বুঝিয়েছিলেন এক সময়। মেয়েদের মনে পাপ ঢুকলেই ছেলেদের সর্বনাশ হয়। বাসন্তীর জীবনটাই ভুল পথে এগিয়ে চলেছে। ওর মনে পাপ ঢুকেছিল। একদিন ধনঞ্জয়ের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তবে মাথুরাকে সে মৃত্যুর পরেও দোষ দিতে চায়। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দোষ স্বীকার করলে মানুষের মৌলিক সত্তার রূপান্তর হয়। সেও ঐ ভাবেই স্বীকার করেছিল, মথুরাকে ওর ভাল লেগেছিল বলেই। কিন্তু সে বুঝল না, ওর কাতর অনুরোধ সে রক্ষা করল না। সে ক্ষমা করে মহৎ হতে পারল না। ওর ব্যাকুল বিলাপ ও করুণ মিনতিতে মথুরার মন নরম হল না। ওকে একটা সুখের একটা শান্তির সংসার রচনা করার সুযোগই দিল না। এমন কি সামান্য অনুকম্পাও দেখাল না। কোন কাজে ওর পৌরুষ প্রকাশ পেল? ওকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের ভাল-লাগা পথ খুঁজে নিল না কেন? সে উদাসী হল, ঘর ছেড়ে দিয়ে আত্মহত্যা করতে গেল। হয়তো চিন্তায় বেশী অস্থির হয় আর এইজন্যেই দুর্ঘটনায় পড়ে। কিন্তু বাসন্তীকে তাড়িয়ে দিয়ে যদি ও নিজে বেঁচে থাকতো তো ওর ভাল লাগত। অন্ততঃ ওর মাথার সিঁদুর মুছতে হত না। হয়তো একদিন ভাঙ্গা বাঁশ জোড়া লাগত। যে লোকটিকে সন্দেহ এত অস্থির করতে পারে, যে মানসিক যন্ত্রণা সম্ভ্রমের সঙ্গে বহন করতে পারে না—সেই লোকটির পুরুষোচিত মনোবল কোথায়? আত্মবিশ্বাস কোথায়? কোথায় সাহস?

দুঃখের দিনগুলোর তীব্রতা আস্তে আস্তে কমে যায়। বাসন্তীকে এই সব চিন্তা আর পীড়িত করে না আজকাল। ওর শুধু এখন একটাই চিন্তা—ভালভাবে ওর সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হ'লেই হ'ল। সন্তানকে নিয়েই ও বেঁচে থাকতে পারবে। ওর এখন ন' মাস। খেতে ভাল

লাগে না মোটেই। রাত্রে ঘুম হয় না—হাঁস-ফাঁস করে। ঘুমও খুব হালকা ধরণের। পেট ব্যথা করে। শাশুড়ী সরষের তেল মালিশ করে দেন পেটে। আগের মত সে নড়া-চড়া করতে পারে না।

বাড়ীতে সবাই ওকে আদর যত্ন করে। ওকে সুগন্ধ চালের ভাত খেতে দেয়। মাস দুয়েক থেকে শোবার আগে সে একপো করে গরুর দুধ খেয়ে আসছে। এখন ভগীরথ মাঝে মাঝে শহরে গিয়ে কিছু কিছু এলোপ্যাথিক ওষুধ আনছেন। এই ওষুধগুলোর আবার অদ্ভুত নাম—অস্টো ক্যালসিয়াম, আয়রণ ট্যাবলেট ইত্যাদি। ওষুধগুলো ভণিতার হাতে দিয়ে ভগীরথ বলে—এই ওষুধগুলো নিয়মিত খেতে হবে। এগুলো খেলে প্রসবের সময় কষ্ট হবে না। সন্তানের হাড় শক্ত হবে। আরেকটা কথা ভণিতা, দশ মাসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই পালসেটিলা—মানে ত্রিশ মাত্রার পালসেটিলা খাওয়াতে হবে। কথাটা মনে রেখ।

এমন সময়ে একটা ঘটনা ঘটল। ম'রাপুর থেকে একজন এসে খবর দেয় যে বাসন্তীর মা মারা গেছেন। ভোগরাম বাসন্তীকে নিয়ে আসার জন্য একটি লোককে পাঠিয়ে দেয়। মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বাসন্তী কান্নাকাটি করে ভেঙে পড়েনি। ওর জীবনে এর চেয়েও বড় শোক সহ্য করতে হয়েছে। এক একটা শোক ওর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দেয়। মা মারা গেছেন, ভালই হয়েছে। বয়স হয়ে ছিল, তা ছাড়া রোগে রোগে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া বুড়ী ওর জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন। মারা যাবার সময় মেয়ের জন্য সবচেয়ে বড় শোক সহ্য করতে হয়েছিল। বেঁচে থাকলে আরও যে কত কি সহ্য করতে হ'ত। জীবনে দুঃখ সইতেই অনেকে জন্ম নেয়।

মায়ের মৃত্যুর কথা শুনে বাসন্তীর এই সব চিন্তাই হচ্ছিল।

হাজার হোক, সুজলা ওর মা। ইহজন্মে ও মা বলে আর কাউকে ডাকতে পারবে না। বাসন্তী খানিকটা কাঁদে।

বাসন্তীর বাড়ীতে শোক জানাতে ভগীরথ ও ভণিতা গেলেন।

বাসন্তী কেন আসতে পারল না, সে কথা তাঁরা ভোগরাম ও তরুলতাকে বুঝিয়ে বলেন।

বাসন্তী মায়ের মৃত্যুর খবর শুনেও কেন যেতে পারে নি—একথা বোঝাবার আর কাউকে প্রয়োজন নেই। সবাই সেকথা জানে। গর্ভবতী রমণীকে সাত মাসে ও ন মাসে বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম ভঙ্গ করলে মায়ের যেমন বিপদ, সন্তানেরও তেমন বিপদ।

মায়ের শ্রাদ্ধে আত্মার শান্তি কামনা করে প্রণাম জানাবার সুযোগ বাসন্তীর ভাগ্যে হল না।

সতের

বাসন্তীর পোয়াতী অবস্থা দশ মাস কাটল না। হঠাৎ প্রসব-বেদনা আরম্ভ হ'ল। বাড়ীর প্রত্যেকেই খুব ব্যস্ত ওকে নিয়ে। ভণিতা ওকে একটা আলাদা ঘরে শুইয়ে রাখেন। ঘরের ছাদের কড়িতে একটা দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে বাসন্তীকে সেই দড়িটা দু'হাতে ধরে থাকতে বলা হয়েছে। দড়িটা আঁকড়ে ধরে বাসন্তী ব্যথা সহ্য করছিল। ভণিতা কাছে বসে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন—কিছু ভয় নেই মা, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

এদিকে ভগীরথ কানুনগোর যেন কোন হুঁস নেই। সাইকেলে করে তিনি চমুয়া গ্রামে গেলেন বজুগুটির কাছে। সে একটু জল পড়া দেয়। জলের পাত্রটা ভণিতার হাতে দিয়ে দেখালেন কেমন করে খাওয়াতে হয়। বাসন্তী সেই জল একটু মাথায় ছিটিয়ে বাকীটা খেয়ে নেয়। কিন্তু কিছুই ফল হ'ল না। দু ঘণ্টা ধরে প্রসব বেদনা চলতে থাকে। আস্তে আস্তে যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। প্রসূতির ঘর থেকে বাসন্তীর আর্তনাদ শুনে ভগীরথের অসহ্য মনে হয়। গ্রামের

দিকে গেলেন দাই আনতে। ওষুধ আনবার জন্য গ্রামের চারদিকে লোক পাঠালেন। বাড়ীতে এসে শোনেন, বাসন্তী যন্ত্রণার চোটে অচেতন। ভগীরথ খুব ভেঙে পড়েন।

ঘণ্টাখানেকের মাথায় একটি ছেলে এসে হাজির হোল ডোল* নিয়ে। ভগীরথই ওকে এক জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। দলংঘাটের মৈমনসিঙের লোক একজনের কাছ থেকে আনা ডোল* একটা বাসন্তীর কোমরে বেঁধে দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ বাদে ওর চেতনা ফিরে এল বটে কিন্তু আরও বেশী করে যন্ত্রনায় ছট্ফট্ করতে থাকে।

খবর পেয়ে দাই কপিলী এসে হাজির হয়। এই বারই ভগীরথ একটু আশ্বস্ত হল। প্রসূতির কাছে একটু বসে সব দেখে শুনে বুঝতে পারে যে অবস্থা সঙ্গীন। ব্যাথাটা নীচের দিকে নেমে এলেও মাঝে মাঝে প্রসূতি মূর্চ্ছা যাচ্ছে। বেশীক্ষণ এমনভাবে থাকলে ও মারা যাবে।

কপিলী আর কারো উপদেশের জন্য অপেক্ষা করল না। কাজে লেগে যায়। হাত লাগিয়ে শিশুকে ভূমিষ্ঠ করে। ভণিতা বাইরে এসে বলে—ছেলে। কিন্তু ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হয়ে কাঁদে নি। সকল যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে আপন আশার আলোয় একবার দেখে নেয় বাসন্তী। নিমেষেই সমস্ত দুঃখ ভুলে যায়। তৃপ্তিতে চোখ বোঁজে।

কিন্তু বাচ্চাটা তো কাঁদেনি? এই ককিয়ে ককিয়ে কেঁওকেঁও কান্নাটা যে কত মিষ্টি! এই কান্নার আওয়াজ বাসন্তীর কানে মধু ঢালবে। নাতির আশায় পথ চেয়ে আছেন ভগীরথ ও ভণিতা। তাঁদেরও এই কান্নাতে মন জুড়িয়ে যাবে।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল নীরবে। কপিলী একটা খারাপ ধরণের সন্দেহ করে। বাচ্চার বুকে হাত্ত দেয়। বুকে দম আছে। হাতের নাড়ীও ধপ্ধপ্ করছে, যদিও অবিরাম চলছে না।

ছুটো ছেলে বাড়ীর ছাদের উপর উঠে ভাঙ্গা টিন বাজিয়ে দিল।

---

*ডোল—দড়ি।

লোকের বিশ্বাস এরকম করলে নিঝুম হয়ে পড়ে থাকা ছেলে সাড়া পায়। কিন্তু কোন ফল হল না। বাচ্চাটার আগের মতই একই অবস্থা, বোধ হয় বাঁচবে না।

কপিলী দিদি বাইরে বেরিয়ে এসে চুপিচুপি বলে, ভগীরথ দা, একটা কাজ কর। বাচ্চা এ রকম করলেও ভয় পাবার কিছু নেই। একেকটা বাচ্চা এরকম ভেক ধরে সংসারে আসে। নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে। এই মান ভাঙাতে হলে বাবার কিছু একটা উপহার দিয়ে খাতির করতে হয়। কিন্তু সে যে দুর্ভাগ্যের সংসারে—পিতৃহীন সংসারে এসেছে। সেজন্য তুমি দাদু হ'লেও তুমি ওকে একবার ডাক।

কপিলীর কথা অনুযায়ী ভগীরথ সব নিয়ম-কানুন এবং সঙ্কোচ দূরে সরিয়ে রেখে প্রসূতির ঘরে ঢোকে। বাসন্তীর তখন জ্ঞান ছিল। ও লম্বা করে ঘোমটা টেনে দেয়। বুড়ো ভগীরথ এক দৃষ্টিতে ওঁর নাতির দিকে তাকান। দেখেন যে, নাতিটি কাঠ হয়ে পড়ে আছে। দূর থেকে দুমিকি সোনা ওর বুকের উপর রাখলেন আর বলেন—বাবা, মান-অভিমান ছাড়। চোখ মেলে তাকাও। আমার দোহাই দাদুর কাছে অভিমান করে আর থেক না।

এই কথা বলে বুড়ো নাতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কাঁদা আর চোখ মেলার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মিনিট পাঁচেক বাদে বাচ্চাটি কেঁপে ওঠে। একটু বাদে মুখখানা কাঁদো কাঁদো করলেও কান্না বেরুল না। গলা থেকে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুতে লাগল। ভণিতা বাচ্চার বুকে হাত দুটো রাখল। সে দুবার চোখ দুটো বড় বড় করে মেলল তারপর চিরদিনের জন্য চোখ বুজল।

ঘণ্টাখানেক পর ঘর একটু শান্ত হ'ল। বাচ্চাটাকে মাটিতে পোঁতবার জন্যে লোক নিতে এল—তখন বাসন্তী এক ভীষণ কাণ্ড বাধাল। কিছুতেই বাচ্চাটাকে ছেড়ে দেবে না। ভণিতা যতই বাচ্চাটাকে নিয়ে যেতে চায়, বাসন্তী ততই ওর বুকের মধ্যে বেশী করে টেনে নেয় বাচ্চাটাকে। শেষকালে দাই কপিলী দিদি নির্দয়ভাবে ওর বুক থেকে কেড়ে আনে। বাসন্তী আর্তনাদ করে মাটিতে

আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগে।—ও আমার সোনা, আমিও যাবো তোর সঙ্গে। মা, বাবা, আমাকেও এর সঙ্গে পুঁতে দাও।

ভণিতা যেন আর সইতে পারছিলেন না, তিনি আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে ভগীরথ শশ্মানের দিকে গেল। ওর পিছন পিছন কাপড় ও কোদাল নিয়ে দুজন গেল।

কপিলী দিদি বাসন্তীকে এরকম অবস্থায় রেখে বাড়ী গেল না। বাচ্চাটা অল্প সময় বেঁচে কেন মারা গেল সেকথা ভাবতে ভাবতে আঁতুড় সাফ করতে থাকে। বিকেল হ'ল। ও যাবার সময় ভণিতা নিজে থেকে কথাটা তুলতে কপিলী মনের কথা বলে।

—কপিলী দিদি, ভগবান এই মেয়েটিকে নিয়ে মজা করছেন। চার মাস হতেই মথুরা মারা গেল। সেদিন মা গেলেন। আজকে আবার এই ঘটনা।

—হ্যাঁ মেয়েরা গর্ভবতী অবস্থাতেই সন্তানের মঙ্গলের জন্য হাসি-খুশী অবস্থায় থাকতে হয়। ওর আবার এর মধ্যেই একটার পর একটা শোক। কত রাত হয়তো কেঁদে কেঁদে না ঘুমিয়েই কাটিয়েছে। বয়সকালে হলেও নিজের মা যখন মারা গেছে তখন তারও দুঃখ আছে। এমন অবস্থায় পোয়াতীর মৃত্যুর আশঙ্কা বেশী। ও কোন রকমে বেঁচে গেল। বাচ্চাটা মরবেই জানতাম। কোন ডাক্তার এসেও ওকে বাঁচাতে পারত না। গর্ভে থাকা অবস্থাতেই ওর কোন দোষ হয়েছে। সাধারণত এরকম অবস্থায় পোয়াতী মারা গেলে তবে বাচ্চাকে পাওয়া যায়।

শেষের দিকে কপিলীর গলাটা কেঁপে ওঠে। ভণিতা চোখের জল লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা না করে প্রায় কেঁদেই বলে ফেলে—আর বলিস না দিদি। যা হবার হয়েছে···

দুদিন বাসন্তী শুয়েই থাকল। তৃতীয় দিন ঘণ্টাখানেকের জন্য চোখ মেলে চাইল। ভনিতা ওকে একটু উঠে বসতে বলেন। ও শুনল না। অনেক বলা কওয়া সত্ত্বেও কিছুই খেল না। না খাওয়ার দরুণ অবশ্যি ভণিতার কিছু খারাপ লাগেনি। প্রথম তিন দিন না

খাওয়াটা কিছু খারাপ নয়। এই সময় অসুস্থ লোকের নাড়ী নরম থাকে। কোন জিনিষ হজম করতে পারে না।

একদিন দুদিন করে দেখতে দেখতে দশ দিন পার হয়ে গেল। জল ছাড়া আর কিছুই মুখে দিল না বাসন্তী। ওর ওঠার শক্তি ছিল না। বাড়ীর সবাই খুবই চিন্তায় পড়ে। ভোগরাম আর তরুলতা এসে অনেক বোঝাল বাসন্তীকে। ও অচল অটল। সবাই ভাবল না খেয়ে মরবে বলে ও প্রতিজ্ঞা করেছে।

বড়রা ওকে কি বলে সান্ত্বনা দেবে ? ওর যে চারিদিকে অন্ধকার। নিজে বাঁচলে তবে তো আবার ছেলের মুখ দেখতে পাবে এমন কথাও তো বলা যায় না। বাচ্চাটা মারা গেল বলে এরকম না খেয়ে কাটাতে হয় ? এই ধরণের মামুলি কথা বলে ওকে মন শক্ত করতে বলে ওরা। সবাই জানে—ও কেন এমন করে মরবে বলে ভাবছে। গ্রামবাসীরা ভগবানকে ডাকছে। ওর বুকের প্রথম এবং শেষ সন্তানটিকে আদর স্নেহ না দিতে পেরে পাগলের মত হওয়াই স্বাভাবিক। যতই শোক হোক না কেন, দশ বারো দিন পরেও কি ওর ক্ষিধে পাবে না ? ওর হয়তো কোন ক্ষিধে না পাওয়া রোগ হয়েছে।

বাড়ীতে ডাক্তার এনে ওকে দেখান হ'ল। ডাক্তার বলেন যে, ওর মনের রোগ। ডাক্তার ভগীরথকে ওর সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিয়ে গেলেন।

বার দিন পার হয়ে গেল। বাসন্তী এখন নিজে থেকেই দরজার সামনে বসতে আরম্ভ করল। আগের থেকে ও অনেক রোগা হয়ে গেছে। এখন ওকে দেখলে দুঃখ হয়। ও আর বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে দেখছে না। কি হচ্ছে না হচ্ছে। যেন কোন কিছু শুনতে পাচ্ছে না বা দেখতে পাচ্ছে না। সব সময় ওপরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবে। আকাশের তারার সঙ্গে ও যেন ভাব করতে চায়।

আগে বাসন্তী শ্বশুর শাশুড়ীর কথা শুনতো। আজকাল আর ওদের অনুরোধ রাখে না। কিন্তু তাতে ওঁরা রাগ করেন না, ভাবেন যে ও আর কত দুঃখ সহ্য করবে ?

বাসন্তীকে নিয়ে ভোগরামের ভীষণ চিন্তা। সে নিজেকে দোষী বলে ভাবছে। ওর দোষেই বাসন্তীর জীবনটা এই রকম হয়ে গেল! ওর এই মাসটায় মোটেই সময় নেই। ঠিকের কাজগুলো তো শেষ করতে হবে এই মাসের মধ্যেই। একদিন বোনের বাড়ীতে থেকে চলে এল। তরুলতা আরেকদিন বেশী থাকল। ছেলেমেয়েদের নানান ঝামেলার জন্য ওর বাসন্তীকে ছেড়ে চলে আসতে হয়।

দিন দুয়েক বাদে একটা ঘটনাতে সবাই অবাক হ'ল। প্রায় দশটা বেজেছে তখন। দরজার সামনে একটানা সাইকেলের তিনবার পরিচিত বেল বাজল। অবাক বিস্ময়ে বাসন্তী সেইদিকে তাকিয়ে থাকে হাঁ করে। ভগীরথও মাথা তুলে তাকায়। চিনতে পারলেন না। কোথাও দেখলেও মনে পড়ছে না। নিজের ছেলের মতই বেশ সুন্দর যুবক। সাদা সার্ট আর হাফ প্যাণ্টে ওকে ঠিক সহরের ডাক্তারের মতই দেখায়। হয়তো বা ডাক্তারই হবে। কারণ সাইকেলের হাতলে ডাক্তারের একটা ব্যাগ ঝোলানো আছে।

সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে গট গট করে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ভিতরে ঢুকে আসে। ওকে দেখে বাসন্তী ভিতরে ঢুকে যায়।

অপরিচিত ভদ্রলোককে বসতে দিয়ে ভগীরথ জিজ্ঞাসা করেন—বাবা, তুমি কে?

সে বলে—আমি বিশেষ পরিচিত লোক নই, তবুও জিজ্ঞাসা করছেন যখন তখন বলি, আমি গাঙচিলার ধনঞ্জয়।

—ওঃ তোমার নাম অনেক শুনেছি। আজ আমি হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। তুমি নিজে থেকেই এসেছ যখন তখন ভালই হয়েছে। তোমাকে বোধ হয় ভোগরাম খবর দিয়েছে?

ধনঞ্জয় মিথ্যে কথাই বলল—না। এই দিকে আসতে শুনলাম। ভাবলাম, একবার দেখে যাই। তবে খাওয়া দাওয়া না করলে আর ওষুধ দিয়ে কি লাভ?

ধনঞ্জয়ের স্বরে হতাশা ফুটে ওঠে। মনটাও দমে গেছে। আসলে

ও যতনা গম্ভীর তার চেয়েও বেশী গম্ভীর হয়ে পড়েছে। ওর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে একবার ভগীরথ ধনঞ্জয়ের দিকে তাকায়। এত পরিষ্কার কাপড় পরেছে কিন্তু মাথার চুলগুলো এলোমেলো অবিন্যস্ত, দাড়ি কামায় নি। কি এক নিদারুণ দুঃখ যেন ওর সুন্দর চোখের উজ্জ্বলতা কেড়ে নিয়েছে।

—ওকে আগে একবার দেখে নেবে না কি বাবা?

—ওকে পাঠান।

ভগীরথ বাড়ীর ভেতরে এসে বাসন্তীকে আসতে বলে আবার ধনঞ্জয়ের কাছে গেলেন। কয়েক দিনের মাথায় বাসন্তী শাশুড়ীর সঙ্গে আজই কথা বলল।

—মা, ওঁকে এখন যেতে বলুন। ভদ্রলোক যেচে যেচে কারও বাড়ীতে আসেন কি করে, লজ্জা করে না?

—তুমি ওকে চেন না কি?

—চিনতাম।

—ওঁর কি দোষ? চিকিৎসা করতে জানে বলে তাই দেখতে এসেছে তোমাকে। তুমি যা-তা বকছ। লোকের বাড়ীতে লোক আসে না না-কি?

এইবার বাসন্তীর হুঁশ হ'ল। ধনঞ্জয় এসে ভুল করেছে। পালিয়ে যেতে না পেরে বাসন্তী যা ভুল করেছিল, আজ সে তার চেয়েও বড় ভুল করেছে। কিন্তু মন থেকে ওর কথা বাদ দিলেও, ধনঞ্জয়ের প্রতি বিরূপ ভাব দেখালেও ও ধরা পড়ে যাবে তাঁদের কাছে। শাশুড়ী নিশ্চয় বলবেন—সবার সামনে বেরোয়, তো এর সামনে বেরোয় না কেন?

ধনঞ্জয়ের সাহস ওর ভাল লাগে। কি সৎ সাহস ওর। ওর পৌরুষ আছে, মনোবল আছে বলেই ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় বিসর্জন দিয়ে ওর দুংখে দুঃখী হতে এসেছে······।

অবশেষে ও শাশুড়ীর সঙ্গে এল-যে ঘরে ধনঞ্জয় বসেছিল সেখানে। একটা পিঁড়িতে বসে পড়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘোমটাটা

কপালের ডান দিকটায় টেনে নেয়। পায়ের নখ দিয়ে একটু একটু করে মাটি খুঁটতে থাকে।

ধনঞ্জয় স্তব্ধ হয়ে রইল। সে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে যে ও খুবই রোগা হয়ে গেছে এবং আগের চেহারার কোন ছায়াও নেই শরীরে। তবুও অবশিষ্ট সৌন্দর্য ও কমনীয়তা ওকে মোহনীয় করে তুলেছে। অবশ্যি ওর সুন্দর চোখের চাহনিতে বেদনা মাখানো। পুত্রহারা মায়ের করুণ মূর্তি।

ধনঞ্জয় কিছু জিজ্ঞাসা করছে না দেখে ভগীরথ ভাবলেন যে ওঁরা থাকার জন্য হয়তো ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। সেজন্য তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর ভণিতাকেও ইংগিতে ডেকে নিলেন।

প্রথমে বাসন্তীই কথা বলে—আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি আসবে। তুমি······

ধনঞ্জয় মৃদু গলায় বলে—আমার হয়তো ভুল হয়েছে, তা সত্ত্বেও না এসে পারলাম না। বুঝেছ, মানুষ বড় অসহায়। মানুষ অক্ষম। মানুষ বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছিলে। হয়তো আমি তার যোগ্য নই। তবুও, তোমাকেই দোষ দি, তোমার কাছেই এসেছি।

বাসন্তী কেঁদে ফেলে। বলে—আমাকে তুমি এমন ভাবে ক্ষমা করে কেন কষ্ট দিতে এসেছ? সময় যে পার হয়ে গেল।

—বুঝেছি।

কি বুঝেছ?

—বুঝেছি, তুমি সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের বধূ।

—হ্যাঁ, আমি হিন্দু বাড়ীর বিধবা। আমি একদিন হোমের কাছে বসেছিলাম। সিঁথিতে সিঁদুর পরেছিলাম। একজনের স্ত্রী হয়েছিলাম। আমার দেহে আরেকজন পুরুষের গন্ধ। তবুও তুমি আমাকে ক্ষমা করলে? কি আশ্চর্য! বুঝেছ, আমি একটি সাধারণ মেয়ে। আমার কথা ভেবে জীবন নষ্ট কোর না। তোমার ভবিষ্যৎ আছে। আমাকে এ ভাবেই থাকতে দাও।

—বাসন্তী!

—বল!

—আমি শুধু তোমায় দেখতে এসেছি।

—ভাল করেছ!

—কিন্তু এখন তুমি নিজেকে এ ভাবে নিঃশেষ করছ কেন? কেন এই পথ বেছে নিয়েছ? এক মুঠো ভাত খেতে কি হয়েছে? তোমাকে আমি আগেই বলেছি, মরতে চাওয়ার মধ্যে কোন গৌরব নেই; এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই আসল কথা। এর মধ্যেই গৌরব।

ধনঞ্জয়ের চোখ দুটো ভিজে যায়। বাসন্তীর চোখ দিয়ে দুধারা বেয়ে গেলেও মনটা শক্ত করে। ও বলে—আমি কথা দিচ্ছি। আমি বেঁচে থাকবো। এভাবে বেঁচে থাকার অর্থ তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে?

ধনঞ্জয় হঠাৎ উত্তর দিতে পারে না। সে মাথা নীচু করে থাকে। ভাবল, ধর্মকে আশ্রয় করে বা পরোপকার করে জীবনটাকে উৎসর্গ করলে জীবনের বাকী দিনগুলো বাসন্তী কাটাতে পারবে না? পারবে, নিশ্চয় পারবে। হিন্দু নারী এমন দৃষ্টান্ত যুগ যুগ ধরে দেখিয়ে এসেছে। কৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থান দিয়ে মীরা বেঁচে থাকার মোহ খুঁজে পেয়েছিলেন। সংগীতের যাদু দিয়ে মনপ্রাণ আপ্লুত করেছিলেন। আরও দৃষ্টান্ত আছে।......

বাসন্তীকে উত্তর দেওয়ার জন্য মাথা তোলে ধনঞ্জয়। ইতিমধ্যে বাসন্তী কখন উঠে গেছে। ভিতর থেকে ওর গলা পাওয়া গেল—মা, আমি ভাত খাব।

ওর মুখ থেকে এই কথা শুনে সবার মনে আনন্দ হয়। তাহলে ও এ যাত্রা বেঁচে যাবে। ধনঞ্জয়ের প্রতি সবাই কৃতজ্ঞ হ'ল।

ধনঞ্জয়ের হাত ধরে ভগীরথ বলে—বাবা, তুমি অদ্ভুত কাজ করলে। ভগবানের কৃপায় তোমার যশ ছড়িয়ে পড়ুক।

গম্ভীর হয়ে ধনঞ্জয় বলে—উনি ভাত চাইলেও প্রথমে ভাত দেবেন

না। প্রথমে লেবু ও ঝোল দেবেন, তারপরে ভাত দেবেন। কারণ পেটে এখন ভাত থাকবে না।

এই বলে ধনঞ্জয় আর একটুও অপেক্ষা করল না। উঠোন থেকে ভণিতা ও ভগীরথ চেঁচিয়ে বলে—মাঝে মাঝে এস বাবা। সে শুনেও না শোনার ভান করে। সে ভগবানকে বলে, এদিকে যেন তার আর কখনও আসতে না হয়।

আঠার

এক সপ্তাহ কেটে গেল। দেখতে দেখতে একপক্ষও পার হ'ল। দরণ্ডিয়াল গ্রামের দিকে ধনঞ্জয়ের আর ছায়াও দেখা গেল না। কার কাছ থেকে বাসন্তী ওর কথা শুনবে? কাকে জিজ্ঞাসা করবে? এখন লোকের সন্দেহ হ'লে অনেক কিছুই রটিয়ে দেবে।

কিন্তু একদিন কাউকে না জিজ্ঞেস করেই ও ধনঞ্জয়ের কথা শুনতে পায়। সোনাইপারের লোকেদের মুখে মুখে ধনঞ্জয়ের সাহসের কথা ছড়িয়ে পড়ল।

ঘটনাটা এমনি ঃ

ভোগরাম আজকাল কণ্ট্রাক্টরী করে অনেক টাকার মালিক হলেও ওর টাকার চিন্তা আরও বেড়ে যায়। ওর টাকা-সর্বস্ব মনটা পিশাচ হয়ে পড়ে। মায়ের মৃত্যু ও বোনের দুর্ভাগ্য ওকে কিছুদিন দমিয়ে রেখেছিল। হয়তো টাকা পয়সা উপার্জন করাটা সাময়িক-ভাবে অসার বলে ভেবেছিল। কিন্তু আজকাল ওর প্রধান সঙ্গী হ'ল, সহরের কিছু লোক—কর্পূর চাঁদ টোডী, রামমিলাপ পচমান, হরবীর ভাটিয়া, এবং সনৎ ফুকন ইত্যাদি। এরা সবাই সহরের বিখ্যাত ধনী। এদের যে কি ধরণের ব্যবসায় কেউ বলতে পারে না। ভোগরামকে এরাই নষ্ট করে দিল। আজকাল ভোগরাম মদও খেতে

ধরেছে। সে সহরে যে কদিন থাকে সে ক'দিন বেশ সুখেই কাটে। সে বড় হোটেলে থাকে। মদ খায়। হোটেলে সম্ভোগের জন্য পয়সা দিয়ে মেয়েও পায়। চারদিকে ভোগের আড়ম্বর দেখে ওর টাকার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী বেড়ে গেছে। যে টাকা আয় করে তাতে ও সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সে স্বপ্ন দেখছে সনৎ ফুকন ও রামমিলাপের মত একটা কাঠের কল বসাবে। হরবীর ভাটিয়ার মত একটা সিনেমা হল তৈরী করবে। লালসার ক্ষণিক তৃপ্তিতে ওর অসন্তোষ বেড়েই চলেছে। মানবীয় সূক্ষ্ম অনুভূতি লোপ পেয়েছে। সোনাইপারের মানুষ হয়ে সোনাইপারের মন হারিয়েছে। কৃষি জীবনের বিপর্যয় দেশের ঘূণধরা অগ্রগতিতে, গ্রাম্য জীবনের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা, নতুন মূল্যবোধ ও পরিস্থিতি—ওর মত নতুন লোকেরা সৃষ্টি করেছে। ওর মত রাহুরা সোনাইপারের সরলতা এবং নীতিবোধ গ্রাস করতে বসেছে। কিন্তু সোনাইর পারে দুর্নীতি ঢুকলেও এখন অবধি লোকদের নষ্ট করতে পারেনি কেউ। কারণ এখানকার লোকেদের একটা অন্তর্নিহিত সততা আছে আর সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যও আছে। সোনাই-এর স্রোত আছে, সোনাই-এর রূপ আছে। সোনাইপারের জীবনের গতি ছন্দে সঠিক তাল লয় আছে।

দলংঘাটের উপরে কাঠের মজবুত সেতু হ'ল। তার থেকে গাঙচিলার মাঝ বরাবর দিয়ে একটা পাকা রাস্তা হবে। আগের দক্ষিণ পারের রাস্তার সঙ্গে যোগাযোগ হবে। নতুন রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ভাটিয়া, টোডী, পাচমান ও ভোগরামও ঠিকা পেয়েছে। নতুন রাস্তাটা বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা। এই রাস্তা কুঁজী দিয়ে টিং বাজারে গিয়ে পৌঁছবে। খুব তাড়াতাড়ি লোকে সার্ভিস বাসে করে আরামে গিয়ে বরদোয়াতে তীর্থ করতে পারবে। আগের মত আর কাদা মাটি মাড়িয়ে বরদোয়াতে দোলের উৎসব দেখতে যেতে হবে না।

গাঙচিলায় একটা সরকারী চিকিৎসালয় স্থাপিত হবে। তার ঠিকা পেয়েছে ভোগরাম। চিকিৎসালয় হওয়ার পর ভোগরামের মত

অনুযায়ী ধনঞ্জয়ের যে চিকিৎসা বন্ধ হবে আর তার রোজগারও বন্ধ হবে—একথা কিন্তু ধনঞ্জয় মনে করল না। হাতীচুও আর জাঁজরিতেও দুটো সরকারী চিকিৎসালয় আছে। সেসব জায়গায় কি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেনি? ঐরকম জায়গাতেও গ্রাম্য ডাক্তারের মূল্য কমে যায়নি।

কিন্তু পাকা রাস্তাটা বরদোয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনাইর উত্তর পারের লোকের আফিং খাওয়া বেড়ে গেল। এটা হচ্ছে কণ্ট্রাক্টরদের কীর্তি। ধনঞ্জয় গাঙচিলাতে একটা শান্তি সেনাদল সংগঠন করে। ওরা পালা করে দলংঘাট থেকে জলমৈ গ্রাম পর্যন্ত সারা রাত্রি পাহারা দিতে আরম্ভ করে। একদিন রাত্রে একটা ছোট নৌকা এসে গাঙচিলার ঘাটে থামে। জিনিসগুলো পারে নামানো হল। একটু পরে একটা গরুর গাড়ীও সেখানে এল। এসব কিন্তু শান্তি সেনার চোখে পড়ে। তারা এসে দেখে ছ সাতটা মাল ভর্তি থলে ভোগরাম পাহারা দিচ্ছে। তার সঙ্গে দু একজন মোটা সোটা লোক। ওদের হাতে একটা করে লাঠি। ওদের চুল আর মোষের শিঙের মত গোঁফ দেখলেই বোঝা যায় ওরা গুণ্ডা। ওদের মুখ দেখলেই ভয় করে। মুখে একটুও কোমলতা নেই—যেন কঠিন ইস্পাত দিয়ে তৈরী।

একজন শান্তি সেনা জিজ্ঞাসা করে—থলেতে কি আছে?

ভোগরাম বলে—বিলিতি মাটি।

—এত রাতে বিলিতি মাটি কেন? দিনে সময় হয় না?

—কদিনের মধ্যেই এই ডিসপেনসারীটা তৈরী করে ফেলতে হবে। কাল আবার রাস্তার কাজে লাগতে হবে তাই এখনই এনেছি। এখন না আনলে কাল সকালে রাজমিস্ত্রী কাজ করবে কি করে?

মিষ্টি কথায় কাজ হবে না ঠিকাদার বাবু! এই থলেগুলোতে অন্য কিছু আছে বলে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। এগুলো এখানে থাক। কাল আমরা পরীক্ষা করার পর নিয়ে যাবেন।

—ভাল কথা বলেছ। গাঙচিলাতে কি মাটি নেই? সিমেণ্টের ভিতরে কি আমি মাটি ভরে আনব?

—আপনি মাটি ভরবেন না, একথা আমরা জানি ঠিকাদারবাবু। আপনি কি এতই বোকা? কালো রঙের মাটি বলেই আমাদের সন্দেহ হচ্ছে।

এই কথা বলার পরই উভয় পক্ষে তুমুল তর্কাতর্কি হ'ল। তর্ক-বিতর্ক শেষকালে হাতাহাতিতে পরিণত হবে এই আশঙ্কায় শান্তি সেনার একজন গিয়ে ধনঞ্জয়কে ডেকে নিয়ে এল। তারা ভোগরামের ফুস্‌লানিতে ভুলল না। একজন শান্তি সেনাকে ভোগরাম আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে—আজকে রাত্রে সিমেণ্ট আটকে থাকলে আমার অসুবিধে মানে 'লস' হবে। কিছু টাকা নাও। এরকম ভাবে বলাতে শান্তি সেনার আরও বেশী সন্দেহ হ'ল।

ধনঞ্জয় ইতিমধ্যে এসে পড়ে। সে শান্তিসেনাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে—তোরা ভোগরামের পকেট চেক্ করেছিলি? ওর কাছে তো পিস্তল থাকতে পারে। ছেলেটা 'নেই' বলে বলার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয় দৌড়ে গিয়ে ভোগরামকে লেঙ্গী মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শান্তি সেনার চারজন ছেলে ভাড়াটে গুণ্ডা দুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একটা আবার শিঙের পেপাটা* বাজিয়ে দেয়। হাতাহাতি মারামারি আরম্ভ হ'ল। ধনঞ্জয় ও ভোগরামের মধ্যে ধস্তাধস্তি হল। গ্রামের লোকেরা দৌড়ে এসে ঘটনাস্থল পৌছে দেখে ধনঞ্জয় ভোগরামের পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে তাঁর বুকের দিকে তাক্ করে রেখেছে। ধনঞ্জয় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—এখনই যদি তোকে গুলী করে লাস্‌টা সোনাইর পারে ভাসিয়ে দি?

—অস্ফুট কণ্ঠে ভোগরাম বলে—আমাকে ক্ষমা কর ধনঞ্জয়।

ধনঞ্জয় ফোঁস করে ওঠে—কাপুরুষ লজ্জা করে না? ভয় নেই—

*পেপা—বাঁশীর মত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

আমরা কাউকে খুন করি না। করতেও পারি না। তোদের মত লোকই খুন করতে আসে। তবে পারে না। তোদের সাহস নেই, কাপুরুষ !

গ্রামবাসীরা ভোগরাম ও গুণ্ডা দুটোকে বেঁধে ফেলে। সকালে পুলিশকে খবর দেওয়া হ'ল। আবগারী বিভাগের লোকও এসেছিল। আবগারী অফিসারটি সোজা ধনঞ্জয়কে প্রশ্ন করে—বস্তা পরীক্ষা করেছিলেন ?

ধনঞ্জয় বলে—না করা হয়নি।

—তাহলে বাজেয়াপ্ত করলেন কেন ? অফিসারটির কথার সুর অন্য ধরণের। ভোগরামের সপক্ষে বলার মত। ধনঞ্জয় সব বুঝতে পারে। কিন্তু সে ভদ্র ভাবে বলে—সরকারের গৃহরক্ষী ও শান্তি সেনা একই জিনিস। আমাদের নিয়ম রাত্রে গ্রামের মধ্যে দিয়ে সন্দেহজনক লোক যেতে পারে না। মাঝরাতে এদের সিমেণ্ট নিয়ে যাওয়ার অর্থ কি ? তাও আবার নৌকা করে এনেছে। দুজনের হাতে লাঠি আরেক জনের হাতে পিস্তল কেন ?

অফিসারটি আর একটি টুঁ শব্দ করলেন না। সবারই খুব কৌতুহল হ'ল। সবাই দাবী করল যে বিলিতি মাটির বস্তাটা সবার সামনে খোলা হোক।

থলে খোলা হ'ল। দুটো থলেতে দুটো আফিঙের পোঁটলা পাওয়া গেল। আবগারী অফিসারটি আফিং ওজন করতেই চাননি সঙ্গে দাঁড়ি-পাল্লা নেই বলে। কিন্তু একজন লোক কোথা থেকে দাড়ি-পাল্লা নিয়ে এল, মেপে দেখা হ'ল—এক কিলো আফিং।

ভোগরাম ও সঙ্গের গুণ্ডা দুটো গ্রেপ্তার হ'ল। সহরে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। সোনাইপারের লোকেদের মধ্যে এই ঘটনা খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে ঘটনাটা। রূপকথার বীর যোদ্ধা হয়ে গেল ধনঞ্জয়। ভোগরামের দুর্নামও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। লোকে আগেই শুনেছিল যে ভোগরাম কালোবাজারী করে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার সাহস ছিল না

কারুর। কারণ আজকাল ভোগরাম সোনাইপারের সবচেয়ে ধনী লোক। ওর যা প্রতিপত্তি—সে ইচ্ছে করলেই লোকের অপকার করতে পারে। তাছাড়া তার কাছ থেকে অনেকে টাকাও ধার নিয়েছে। আজকাল ওকে লোকে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলত। তার কাছে অনেক লোকই মাথা নীচু করে থাকত। আর সম্প্রতি ও যা বিরাট রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী করেছে তাতে ঢুকতে সাধারণ লোকের তো ভয়ই হয়।

সাত দিন ভোগরাম হাজতে ছিল। ওর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল সেটা ভীষণ মারাত্মক ধরণের। অর্থাৎ আইনের মারপ্যাঁচে ধনঞ্জয়ের দিকে বৃহস্পতি সদয়। তার দু বছর জেল হ'ল। বাকী দুজন লোকের হ'ল ছ মাস। কারণ বিলিতি মাটির মালিক তারা নয়—মালিক ভোগরাম।

জেলে যাওয়ার আগে তরুলতা আর ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ও চোখের জল ফেলেনি। ওর মুখে কেবল কঠিন দৃঢ়তার ছাপ ফুটে উঠেছিল খাচার ভিতর থেকে সিংহের প্রতি-হিংসার দৃষ্টি যেন দূরে নিবদ্ধ। তরুলতা কাঁদছিল। কারণ ভোগরামের ব্যথায় আর মুখে ভবিষ্যতে সৎ হওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল না। সে জেলে যাওয়ার আগে চেক-বুকের দুটো পাতায় সই করে দিয়ে বলেছিল—এই টাকা রইল ক্রস চেক। দুবছর এতে চলে যাবে অনায়াসে। টাকা পয়সার কোন অসুবিধে হ'লে টোডী বা সনৎ ফুকনকে বললেই হবে।

কথাগুলো শুনে বাসন্তী ঘটনার তাৎপর্য খুঁজে বের করে। বৌদির জন্য ওর খুব দুঃখ হ'ল। কিন্তু কি বিশেষ নতুন কথা বলে ও তরুলতাকে সান্ত্বনা দেবে? তরুলতাও বা কেমন করে লজ্জা অপমান সহ্য করে দরঙিয়ালে এসে ওর মনের কথা বলবে? বাসন্তীও বা কেমন করে ম'রাপুরে যাবে তরুলতার সঙ্গে দেখা করতে? ওর যে তখন ভোগরামের বোন বলে পরিচয় দিতেই লজ্জা করছে। ভাবল, জীবনে আর জন্মভিটেতে যাওয়া ওর কপালে ঘটবে না।

এত দুঃখেও ওর ধনঞ্জয়কে মনে পড়ে আর লোকের মুখে ওর প্রশংসা শুনে ওর দেহে মনে বিদ্যুতের শিহরণ খেলে যায়।

বাসন্তীর এরকম মনমরা অবস্থা দেখে ভগীরথ আবার চিন্তায় পড়লেন। তিনি একদিন নিজে থেকেই বললেন—বাসন্তী দাদার কথা চিন্তা করে লাভ নেই। অর্থই দাদার সর্বনাশ করেছে। দাদা খারাপ হ'লে লোকে কখোনো বোনকে খারাপ বলে ভাবে কি? এইটে তোরই বাড়ী মা। আমরাই তোর মা বাবা। আমরা খারাপ হ'লে কিম্বা আমাদের খারাপ বললে তোর খারাপ লাগার কথা।

বুড়োর কথা শুনে বাসন্তীর শরীরটা জল হয়ে যায়। বুড়োকেই পৃথিবীর সবার চেয়ে জ্ঞানী মনে হল। ও কৌতূহল দমন না করতে না পেরে বুড়োকে জিজ্ঞাসা করে—বাবা, একটা কথা আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন?

—বল, মা।

—ভোগরাম আমার জন্য খুব ভাবত। আমাকে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ার দিনও সে খুব দুঃখ করেছিল। তার বাড়ীতে পর্যন্ত মন বসেনি। আমি বিধবা হওয়াতে, আমার ছেলেটি মারা যাওয়াতেও ও খুবই দুঃখ পেয়েছিল। তার মনটা এত কোমল! কিন্তু সেই ভোগরামই আবার অত খারাপ কেন? তাহলে কোন লোককেই বিশ্বাস করা যায় না, বলুন!

প্রশ্নটা শুনে অভিজ্ঞ জ্ঞানী ভগীরথও মুস্কিলে পড়ে যান। ভাবেন আজীবন দুঃখ সহ্য করার ফলে মেয়েটির মনের গভীরতা বাড়ছে। ও জানতে চায়—মূল সত্য। কিন্তু এই জগতে একমাত্র পরম পুরুষ বাদে আর কি মূল সত্য থাকতে পারে? ধীর কণ্ঠে ভগীরথ বলেন—মা, এই বৃদ্ধ বয়সেও তোর প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারব না। আমার আর কতটুকু বিদ্যে; তবুও ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে বলে ভুল করিনি বলেই মাঝে মাঝে ভাবি! বই পত্র পড়িস। শাস্ত্রই মনের সকল সংশয় সকল দুঃখ দূর করতে পারে।

—পড়ব বাবা! কিন্তু এখন আমার মনটা বড় অস্থির।

—মা, আমি মনে করি, একটা লোকেরই দুটো মন আছে। সেজন্য সবসময় কাছের লোককেও বোঝা শক্ত। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কয়েক কিলোমিটার গভীরে তেল, কয়লা হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের মনের তল খুঁজে পাওয়া যায় না। একই সঙ্গে মানুষের দুটো মন খেলা করে বলেই একজন লোকের আরেকজন লোকের প্রতি কৌতূহল এত বেশী। মানুষ দোষ গুণের সমষ্টি। ত্রুটিহীন লোক খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল। তাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি ভাল গুণের চেয়ে খারাপ গুণের মাত্রাধিক্য হলে দেশটা কলঙ্কিত হয়ে পড়ে। লোক নিজেই নিজের ধ্বংসের পথ খুঁজে পায়। ভোগরামেরও তাই হয়েছে। সেজন্য মা, মনটা স্থির করতে হ'লে ভগবানে বিশ্বাসের প্রয়োজন। বাসনা, লোভ ও মোহের কোন সীমা নেই। সেজন্য মানুষের সুখ নেই। সেজন্যই শাস্ত্রের যুক্তি এত প্রয়োজন। নিষ্কাম ভক্তি দিয়ে আত্মাকে ভগবানের সঙ্গে বিলীন করে দিতে পারলে লোকে প্রকৃত শান্তি লাভ করে। মন একমুখী হয়। অহংকার দূর হয়। জীব মুক্তি পায়। তাই মনে হয় শঙ্কর মাধব আমাদের যা দিয়ে গেছেন আজ পাঁচ শ বছরেও আমাদের কোন নেতা বা গুরু তা দিতে পারেন নি। এমন কি তার মূল্য বুঝেছেন কি না সন্দেহ।

ভগীরথ তখন বাসন্তীর উপস্থিতি ভুলে গিয়ে ঘোষা থেকে পদ গাইতে লাগলেন ঃ

কর্মত বিশ্বাস যার হিয়াত থাকন্ত হরি
অতিশয় দূর হোন্ত তার
দূরতো বিদূর হোন্ত অহংকার থাকন্তেয়ো
সাক্ষাতে কৃষ্ণক পায়
শ্রবণ কীর্তন ধর্ম যার ॥

বাসন্তীর প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। ঘরটা হঠাৎ তীর্থস্থানে পরিণত হয়। ও শ্বশুরের কাছ থেকে সরে যায়। সামনের সোনাইর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। শীতে সোনাইর স্রোতের গতি ধীর।

আগের সে উচ্ছলতা নেই। জল স্ফটিকের মত। এও সোনাইর নতুন রূপ। এই রূপেও মহিমা আছে। এইটে যেন সোনাইর নিস্পৃহ রূপ — মাঘ মাসের হাড় কাঁপানো শীতও এই রূপকে ম্লান করতে পারেনি।

পরের দিন থেকে বাসন্তী ফুল দেওয়া রিহা আর পাড় লাগানো মেখেলা পরতে আরম্ভ করল। পারুলদের মত চুল বাঁধতে শুরু করে। শুধু কপালে ফোটা দেয়নি বলে বিধবা বলে বোঝা যায়।

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভগীরথ কানুনগো পেন্সনের টাকা আনতে সহরে গেলেন। সেই টাকা থেকে 'শ্রী শঙ্কর বাক্যামৃত' নামের প্রকাণ্ড ছাপা পুঁথি ও রত্নাবলী একখানা নিয়ে এলেন। ঘোষা একখানা তো বাড়ীতে আছেই। সঙ্গে একখানা অসমীয়া অভিধানও কিনলেন। পুঁথি দুখানা আর অভিধানটা বাসন্তীকে দিলেন।

আস্তে আস্তে বাসন্তীর মুখে প্রসন্নতা এল। বাড়ীতে ওকে কেউ কাজ করতে বলে না। ও দুবেলা এবং অবসর সময়ে পুঁথি পড়লেও আগের মত উৎসাহ নিয়ে আবার কাজ কর্ম করে। দিনের পরে রাত আসে, রাতের পর দিন। বাসন্তীর কাছে অর্থহীন তারিখগুলো এগিয়ে যেতে থাকে এক এক করে। তারিখ এগিয়ে গিয়ে হয় মাস। নতুন নতুন মাসের নতুন নতুন রূপে আবির্ভাব ঘটে। ছয় ঋতু সোনাইপারের লোককে চির নতুন আনন্দ উৎসাহ দেয়। কোন ঋতুতে বিয়ে হয়, কোন ঋতুতে মা প্রথম সন্তানের মুখ দেখে। কারো হয়তো হৃদয়ে প্রেমের অঙ্কুর জন্মে। বাসন্তীর মনের দ্বার প্রকৃতির এই আনন্দের খেলায় রুদ্ধ। সুখের ভবিষ্যৎ ও চায় না, দুরাশা ওকে বিচলিত করে, সামাজিক নীতি নিয়মের দ্বারা শাসিত বাসন্তীর দেহ-মন যৌবনের স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। তাই নিজেকে শান্ত করতে ও বিকল্প পথ খোঁজে। পারুল পুতুলীদের সঙ্গে মিলে মিশে দিন কাটায়। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি করে আর তাদের আদর স্নেহ গ্রহণ করে, বাড়ীর কাজে কর্মে ব্যস্ত থেকে শাস্ত্রের মধ্যে মনটা ডুবিয়ে দিয়ে সুখী হতে চায় বাসন্তী।

দুবছর পার হয়ে যায়। দুবছরে দুটো বসন্ত, দুটো বর্ষা, দুটো

বুক হিম করা শীত কেটে যায়। অনেক দিন! যুবতী মেয়ের কাছে দিনগুলো আরও বেশী মনে হয়। গতানুগতিক জীবন ওকে এক-ঘেঁয়েমি এনে দেয়। আদর স্নেহ, লোকের প্রশংসা আর এমন কি পুঁথি পড়ে যে মর্ম ও জানতে পেরেছে—এই সব কিছুই ওর জীবনে এক ঘেঁয়েমি এনে দেয়। শিশিরের ফোঁটাতে মুক্তো ঝরে না, দিন দিন বেদনা ওর ভবিষ্যতকে উষার আলোতেও ম্লান কয়ে দেয়। সূর্যের রঙ মাখানো মেঘ ওর মনের বাসনা, দেহের তৃপ্তি ও নিঝুম রাতের গোপন আকাঙ্ক্ষাকে লাল-হলদে রঙ মাখায় না।

আস্তে আস্তে বাসন্তীর মনটা অস্থির হয়ে পড়ে। ও আবার থান কাপড় পরতে আরম্ভ করেছে। বাড়ীর কাজকর্ম করছে না এখন, ইচ্ছে হলে পুঁথি পড়ে, যদিও আগের মত পড়ে না। নামঘরের যাত্রা দেখতে যায় না। নামঘরে এয়োতীদের নাম হয়। বাসন্তী যায় না। কীর্ত্তনের পদ সেখানে বিভিন্ন সুরে গাওয়া হয়। পদের কিছুটা আলোচনা হয়। পুত্রের শোকে যশোদা জননীর বিলাপে মায়ের চোখের জল আসে। এসব দেখে শুনে বাসন্তীর শোক আরো বাড়ে।

আস্তে আস্তে সে বাইরে বেরুনো বন্ধ করে। দরজার কাছে বসে সোনাইর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবে। কারুর সঙ্গে কথা বলে না। ভণিতা ও ভগীরথ চিন্তায় পড়েন। সোনাইর বুকে নামে বর্ষা। প্রকৃতি মুখর হয়। সোনাইপারের বালিমাহী পাখীও সঙ্গে সঙ্গী পেয়ে আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। শীতল জলে শরীর ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করে। মাছ ডিম ছাড়ে। মাছের গায়ে তেল ধরে। সোনাই যৌবন লাভ করে। বাসন্তীর তুকুল উপছানো যৌবন কিসে যেন বাধা পায়। সোনাইপারের প্রকৃতি ও সোনাইপারের লোক ওকে ভুলে যায়। ও ভাবে শ্মশানের স্ফুলিঙ্গেরও আপন অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ওর নেই। ও আর জীবনের অস্তিত্বের অহঙ্কারে বেঁচে থাকতে পারে না। ওর উপর অন্যের উদাসীন দৃষ্টি ওর অসহনীয় লাগে। সে পথ খুঁজে বেড়ায়। গৃহে থেকেও নিষ্ঠুর বৈরাগ্যের পথ ও দেখতে পায়।

উনিশ

দু'বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। সোনাইপারের কাঁকর বিছানো রাস্তাটা টিং বাজারে গিয়ে পৌঁছায়। দিন দুটো করে সার্ভিস বাস চলে। মানুষের মনও জটিল হয়েছে এখন। তারা স্বার্থপর হয়েছে। বাড়ীর মেয়ে বৌদের নতুন রকম দুর্নাম রটে। পঞ্চায়েত রাজ হ'ল। পঞ্চায়েতের মেম্বার সভাপতি নির্বাচন করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঝগড়া-ঝাটি আর মারপিট হয়। গ্রামে হিংসা আর দ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর পারটাও দক্ষিণ পারের মত খারাপ হয়ে যায়। আজকাল ভাল লোকের কথা আর কেউ শোনে না।

গাঙচিলার সরকারী চিকিৎসালয়ে এম. বি. বি. এস. ডাক্তার এল। সোনাইর মাছ ধরার জায়গাগুলো সরকার হাজার হাজার টাকায় লীজ নেয়। অন্য জায়গা থেকে জেলেরা এসে নতুন কায়দায় মাছ ধরতে শেখে। তারা সোনাইপারের জেলেদের মুখের ভাত কেড়ে নেয়।

সোনাই-এর জীবন-যাত্রায় স্পন্দন বেড়ে যায়। সহর থেকে এখন খবরের কাগজ আসে। পচা মালের দোকানের সামনে, বইএর দোকানের সামনে নয়তো স্কুলঘরের সামনে দল বেঁধে কাগজ পড়তে আসে সবাই। এম. এল. এ ও মন্ত্রীর নাম সবার মুখে মুখে। সোনাই-পারের লোকেরা এখন রাজনীতি বুঝতে পারে। সোজা কথায় সোনাইর পারে এখন 'পলিটিক্স' ঢুকেছে।

ভগীরথ বুড়ো কোন এক পেন্সনভোগীদের সংস্থার সভাপতি হলেন। এই দু'বছরের মধ্যে পারুল ও পুতুলীর বিয়ে হয়ে গেল। এখন বাড়ীতে কেবল বুড়ো-বুড়ী ও বাসন্তী থাকে। মথুরার ভাই নন্দেশ্বর ছোটবেলা থেকে সহরে পড়া-শুনা করে। সে ওভারসিয়ার পাশ করে জেলায় কাজে ঢোকে। সেও থাকে দূরে দূরেই। ভবিষ্যতে সেও আর সোনাইপারে আসবে না হয়তো।

জেল থেকে বেরিয়েই ভোগরাম তার বিরাট জমকালো বাড়ীটা কয়েক শ' টাকায় সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রকে ভাড়া দিল। নিজে সহরে একটা বাড়ী তৈরী করল। সহরে সে তার সঞ্চিত টাকা থেকে

একটা ধানের কল কেনে, আর কাপড়ের দোকানও খুলল। তরুলতাকেও সে সহরে নিয়ে গেল। ওরাও সোনাইপারের জীবন ছেড়ে চলে যায়।

চারদিকের এত পরিবর্তন বাসন্তী লোকের মুখ থেকে শুনতে পেল। (অবশ্যি পারুল আর পুতুলীর বিয়ের কথা আলাদা)। ননদদের বিয়ে হয়ে যাওরার পর আর বড় কেউ একটা আসে না। ভগীরথের বাড়ীটা যেন বাঁশতলা হয়ে যায়। বাসন্তীর গায়ের চাঁপা ফুলের রঙে কেউ যেন ছাই মাখিয়ে দেয়। বেদনার কালিতে ওর চোখের জ্যোতি যেন নিভে যায়। ওর খোদাই করা অপরূপ মূর্তিটা যেন কোন কালপাহাড় এসে ধ্বংস করে দেয়! ও দু'এক বছর এমন করেই দিন কাটায়। এভাবে থাকাটাই ওর শেষে অভ্যাসে দাঁড়াল। ও কাউকে নিজের দুঃখ কষ্ট জানতে না দিয়ে সহ্য করে। কারুর করুণার পাত্রী না হওয়াটাই জীবনের সাধনা বলে ভেবে নেয়।

কিন্তু হঠাৎ সব ওলট-পালট হয়ে যায়। মনবরী নামে একটি মেয়ের প্ররোচনায় ওর মনে নতুন আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। ওর মন যেন নতুন করে সজীব হয়ে ওঠে। মাটির কোলে মানুষ রক্ত-মাংসের নারীর মন।......

কুড়ি

দরঙিয়াল থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে দৈচকলায় মনবরীর বাড়ী। চারটে ছেলে মেয়ের মা মনবরী। স্বামী অসুস্থ বলে বাড়ীতেই থাকে। বাড়ীতে ভরণ-পোষণের ভার মনবরীর উপরেই। আগে ও উত্তম অধিকারের বাড়ীতে ধান চাল ভেনে দিত, বাসন মাজত। ওর বাড়ী থেকে অধিকারের বাড়ী অনেকটা দূর বলেই ও ওখানের কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

পারুল আর পুতুলীর বিয়ের পর ভগীরথ কানুনগোর সংসারের কাজ আর ভণিতা সামলাতে পারত না। ইচ্ছে করলে বাসন্তী কাজ-কর্ম করে, আর ইচ্ছে না হলে একটা কুটো গাছিও নাড়ে না। সেজন্য

কানুনগো মনবরীকে যোগাড় করেন। মনবরী টাকা পায়। অধিকারের বাড়ীতে যে কাজ করত এখানেও সেই কাজই করে। অবশ্যি ধান চাল ভানতে বা কুটতে হয় না। দুটো গরু দোয়, গোয়াল সাফ করে, বাসন মাজে। সময় পেলে তরি-তরকারীও কুটে দেয়। বেলা বেশী না হতেই সে আসে দুপুরে কানুনগোর বাড়ীতে ভাত খায়, তারপর দৈচকলায় চলে যায়। কানুনগো আর ভণিতা দুজনেই ওকে খুব ভালবাসে। ও যা চায় তাই পায়। ও এই বাড়ীতে আসার পর থেকেই বাসন্তীর মুখে হাসি ফোটে। ওর মনের অনেক শূন্যতা পূর্ণ করে দেয় মনবরী।

মনবরী নিজের গ্রামের কথা বলে বাসন্তীকে। অতি সাধারণ একটা কথা কেমন সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রঙ চড়িয়ে বলে মনবরী যে শুনতে ভালই লাগে। রোজ একটা না একটা ঘটনা মনবরী বলবেই। কিন্তু বাসন্তীর প্রশ্নগুলো ভারী অদ্ভুত ধরণের—আচ্ছা মনবরী, এখনও সোনাইতে মাচা বেঁধে লোকে মাছ ধরে কি? বর্ষায় মেঘে আকাশ ঢেকে ফেললে সোনাইর মাছগুলো লাফায় নাকি? তখন বনজঙ্গলের পাখীগুলো কি চীৎকার করে? খোলা মাঠে রাখাল ছেলেরা মোষের পিঠের উপর চড়ে বনঘোষা গায় নাকি? কাতি বিহুতে ফসল দেখতে আসা যুবতীকে টেনে নিয়ে পালিয়ে যায় না কেউ?—ইত্যাদি। মনবরী এই প্রশ্নগুলোর মানে ধরতে পারে না। এগুলো তো ওর গ্রামের আশেপাশেই ঘটে থাকে। এ সব কথা আবার জিজ্ঞাসা করার কি আছে?

মনবরীর সঙ্গে বাসন্তী গল্পগুজব করে, হয় গোয়ালঘরে নয়তো খড়ের ঘরটার মধ্যিখানে যে খোলা জায়গাটা আছে সেখানে। রোদের সময় এই ব্যবস্থা। সাধারণতঃ ওদের দুজনকার গোপন আলোচনা হয় বাঁদিকের কুঠরীটায়। এই কুঠরীটাতে আগে সুতো পাকান লাটাই, ঘুণে নষ্ট করা খোল, আর বড় বড় লাউ শুকিয়ে রাখা হ'ত, এখন ঐ সব কিছুই নেই। কয়েকটা নাগা পাটী, আর খান তিনেক পিঁড়ী আছে। এই ঘরটাতে দুজন বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বলতে

পারে। প্রথম দিন এই ঘরটাতে ঢুকেই দুজনে দুজনের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। একজন আরেকজনকে চিনতে পারে ভালভাবে।

মনবরী বলে—তোমাকে দিদি, ঈশ্বর খুব বঞ্চিত করেছেন। তুমি এই ভাবে কি করে জীবন কাটাচ্ছ ?

—দিদি, আর এসব কথা বোলো না। এইভাবে থাকতে থাকতে অভ্যাস হয়ে গেছে। মনবরী, তোমার সঙ্গে কথা বল্লে খুবই ভাল লাগে। তুমি আমাকে আমার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করো না।

সেদিন থেকে মনবরী আর ওকে এই ধরণের প্রশ্ন করত না। লোকের মুখে ও অনেক কিছুই শুনেছে বাসন্তীর বিষয়ে; কিন্তু বাসন্তীর নিজের মুখ থেকে কিছুই শোনেনি। বাসন্তী চাপা মেয়ে। অবশ্যি সে খারাপ মেয়ে নয়। ওর রুচিও আলাদা। একদিন হয়তো বলবে,—কঠনাতলীর থেকে একমুঠো শিউলি ফুল নিয়ে আসিস তো মনবরী। মনবরী জিজ্ঞাসা করে—কেন ? বাসন্তী তখন বলে—রাতে ঘুম না হ'লে শিউলির গন্ধে সারারাত কাটাতে খুব ভাল লাগে। অন্য একদিন বলবে হয়তো —মনবরী দিদি, মনে পড়েছে, সোনাইরপারে বোধ হয় ফুকন ঘাটের কাছে একটা কদম ফুলের গাছ আছে। কি জানি হয়তো গাছের নীচে কদমের চারা আছে। তারই একটা চারা এনে আমাদের বাগানের পিছন দিকে পুঁতে দিস্ তো। মনবীর বলবে—নিশ্চয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই কদম ফুলের চারা এনে পুঁতে দেবে। আর একদিন হয়তো বাসন্তী বলবে—মনবরী কাল রাত্রে চুপি চুপি খড়ের ঘরটার কাছে গিয়েছিলাম আর খড়ের উপর শুয়েছিলাম। ফুট্‌ফুটে চাঁদের আলো। খড়ের ঘরটাও যে কি সুন্দর লাগছিল ! মনবরীও চালাক। এই ধরণের কথা শুনে মুখ টিপে হাসবে আর বোকার মত প্রশ্ন করবে—খোবাখুবুনীর (আসামের একটি লোককথার নায়ক-নায়িকা) রাত্তিরে শোবার ঘরের মত ? উত্তর বাসন্তী দেয়—মরণ, তুই বুঝি আর অন্য উপমা খুঁজে পেলি না ?

শরৎ কাল। আশ্বিন মাস। দরঙিয়াল গ্রামে আনন্দের ঢেউ। এখন থেকেই রাস যাত্রার আখড়া বসছে। আজকাল সন্ধ্যেবেলা

কানুনগোও ঘরে থাকেন না। বাসন্তীর মনে ভাবের উদ্রেক হয়েছে, খোল-তাল আর গীতপদে সন্ধ্যার অন্ধকারও দূর হয়েছে। (নাম-ঘরটা খুব বেশী দূরে নয়) কাঁসর ঘণ্টা, খোল-করতাল, মৃদঙ্গর আওয়াজ আর গীতপদ বাড়ী থেকেই কানে আসে। গীতপদগুলো যে কেমন যেন মনপ্রাণ উচাটন করে। তিলকসূত্রধারীর 'অর্থ ভটিমা' প্রাণ উতলা করে দেয়ঃ বিরিন্দা বিপিন বিহার বিশারদ শারদ ইন্দু পরকাশী—। তার পরেই খোলের বোল—রিত্তা থেই, থেইনা থিতি, রিততা থেই থেই, থেইনা থেই তাত্তা থিতি······।

এই শরতে মনবরী আর বাসন্তী—আরও বেশী ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। বাসন্তী মনের খেদে বলে—মনবরী, তুই যে সন্ধ্যার পর চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দৈচকলাতে আসিস তখন তোর মনটা উতলা হয় না ?

—কি যে বল দিদি আমাদের কি আর সেদিন আছে ? চারটে ছেলের মা হলাম। পথে যেতে কত চিন্তা। ছেলেমেয়েরা ঠিকমত খেল কি না, কলিমনের ব্যাথাটা কেমন আছে—এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই পথ ফুরিয়ে যায়।

—না, তুই মিথ্যে কথা বলছিস। এখন শরৎ কাল। ঘরে থেকেই টের পাচ্ছি, গাছ-গাছড়া ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। সোনাই-পারে চাতক-চাতকী বাসা বেঁধেছে হয়তো–মহাপুরুষ মাধবদেব তাই তো এই গীতি রচনা করেছিলেন–জলর যতেক মন যেহেন শরতকালে স্বভাবতে নির্মল হোয়য়।

—আমাদের কি এত বিদ্যে আছে মা ?

সেদিন মনবরীকে একদম রসকসহীন মনে হয়েছিল বাসন্তীর। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে ওকে আবার ভাল লেগে গেল।

শরৎ কালে সোনাইপারের গ্রামগুলো শরতের মতই সজীব হয়ে পড়েছে—ধানক্ষেত, মানুষের মন সবই। সোনাইর পারে গাঙচিল যেন প্রণয়ের বার্তা নিয়ে এসেছে। বাসন্তীর অন্তর ভরে উঠেছে। বাইরের ছোট পৃথিবীতে মন দেয়া-নেয়ার জোয়ার উঠেছে। সেজন্য দু'তিন দিন পর পর মনবরী বাসন্তীকে বলে একেকটা প্রণয়ের

কাহিনী ঃ যত্ন সাতোলার মেয়ে চম্পার হাতের চুড়ি সোনাইপারে পড়েছিল। ও হেন সুধনার সঙ্গে গোপনে নদীর পারে রাত্রে বসেছিল। ওরা এতই মস্‌গুল যে কখন চুড়ি খুলে গেছে তা জানে না।
ঃ বাবা যখন আখড়ায় ছিল, মা তখন ছিল রান্নাঘরে। এমন সময় ধর্মেশ্বর ঘরে ঢোকে। মনোমতী কাছেই পুরুষের গন্ধ পেল। কারো মুখে কথা নেই। পরে ও যখন বাড়ী গিয়ে পৌছায়, তখন সবারই চক্ষুস্থির। ওর জামার বুকের কাছে কয়েক জায়গায় সিঁদুরের দাগ।
ঃ জুরণ মেধীর বিধবা পুত্রবধূটি আর এক বছরের বাচ্চা নিয়ে একজনের সঙ্গে পালিয়ে যাবে না তো? যার কাছে গেছে সে······
ঃ কাল রাত্রে সোন্দরের বাড়ীর যে ঘরে বৌ ছিল তার জানালা কেটে চোর ঢুকেছিল। ছেলে আবার ছিল খামারে। চোর কিন্তু গয়না-গাঁটি, কিম্বা কাপড়-চোপড় কিছু নেয়নি। এ আবার কি রকম ধরনের চোর? আসলে কথা হচ্ছে অন্য রকম। বৌটা নিজের ঘরের দরজায় খিল আটকায়না, কেউ না কেউ একজন—আমাদের সেই বরসাজ প্রায়ই আসে। কাল বাড়ীর সবাই শব্দ শুনতে পায়। ও তক্ষুনি পালায়।

এরকম ধরণের এক একটা সোনাইপারের প্রণয়-কাহিনী বাসন্তীকে দেয় নতুন তৃপ্তি। শেষে মনবরী যখন আরেকটা কাহিনী বলে সেইটে শুনে বাসন্তীর পূর্ণ তৃপ্তি হয়। এই কাহিনীর যুবক-যুবতী ওর চোখে যেন রক্ত-মাংসের রূপ নিল। ওর ওদের প্রতি গভীর সহানুভূতিও হ'ল।

দৈচকলার মণ্ড বায়েনের মেয়ের নাম হচ্ছে কাচনমতী। খুব সুন্দরী রূপসী সে। এখন ওকে নিয়ে দৈচকলায় নানা কানাঘুষো।

—কি ব্যাপার?

—দিদি, এর বেশী ভাগ কথা বোঝা যায় না।

—কি হ'ল?

—বায়েনের বাড়ীর লাঙ্গল চষা বাজুকে নিয়ে যত কথা।

প্রথম দিন মনবরী বলে যে বাজু হীরা মণ্ড বায়েনের চোখে ধরা

পড়ে। গত ছু'বছর ধরে বাজু বায়েনের বাড়ীতে রোজ খাটছে। ছেলেটা খুবই সাদাসিধে। বড় ভাল চাষী। সে বায়েনের আপন হয়ে পড়ে। সে বায়েনের ডান হাত। বাজুর জন্যই বায়েনের বাড়ীর চাষের ফসল বছর বছর বেড়েই যাচ্ছে।

কিন্তু হিতে বিপরীত হ'ল। বাজু আর কাচনমতী ছু'জনে প্রণয়ে আবদ্ধ হ'ল। একদিন ছুপুরবেলা, মণ্ড বায়েন দলংঘাট বাজার থেকে এসে দেখে—বাজু কাচনমতীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে? রাগে বায়েন কাঁপতে লাগল। সে মেয়ের ঘরে ঢুকবে কেন? বাজু চলে গেলে বায়েন স্ত্রীর কাছে, মেয়ের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিল। মেয়ে বিছানায় নিঝুম হয়ে শুয়ে পড়েছে। মা বুঝতে পারল না, কেন ছুপুর না হলেই মেয়ের এত ঘুম। কিন্তু ওরা দেরীতে টের পেল ঘটনাটা। এদিকে গ্রামের লোকেরা আগে থেকেই কানাঘুষো করছিল।

মনবরী বলে, কাচনমতীর শোবার ঘরটাকে ঢুকলে কেমন কেমন লাগে। আপনার বয়সের মেয়েদের ঐ ঘরে ঢুকলে মনটা ছটফট করবে।

বাসন্তী ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করে—তুই কি বায়েনের ঘরে যাস্?

মনবরী জিজ্ঞাসা করে—প্রায়ই যাই। ও ঘরটাকে কেমন যেন সাজিয়ে রেখেছে। দেয়ালে নানা রঙবেরঙের ফটো টাঙিয়েছে। দেখলেই লজ্জা লাগে। এই ফটোগুলো ইংরিজী বইয়ে থাকে। কিন্তু ইংরাজী বইটা এলো কোত্থেকে? বীরেন দোকানীর মাল বেচতে নিয়ে আসা কাগজের মধ্যে একটা চওড়া ইংরাজী বই থাকে। এই সব বই থেকে পাতা ছিঁড়ে বাজু ওকে এনে দেয়। ওর ঘরে কপৌ* ফুল থাকে। এখন বকুল, যুঁই রজনীগন্ধার গন্ধে সুবাস ছড়িয়ে পড়ে।

—আচ্ছা ওসব কথা থাক। মণ্ড বায়েন বাজুকে কি বললে?

—সেদিন কিছু বলল না। পরের দিনও ওকে সাবধান করল না। চাষের ভাগ না দিয়ে ওকে তাড়িয়ে দিল।

*কপৌ—এই ফুল (cactus) আসামে জন্মায়।

এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাসন্তী।

দিন কয়েক মনবরী কাচনমতীর কথা বলল না। এগার দিনের মাথায় বলে যে, কাচনমতী বাবার কাছে মার খেয়েছে। মাও খুব বকেছে ওকে। আজকাল আর কাচনকে আলাদা ঘরে শুতে দেয় না। মায়ের সঙ্গে শোয়। রাত্রে মেয়ে কাছে শুয়ে আছে কিনা জেগে জেগে উঠে মা দেখে।

বাসন্তীর আরও দুঃখ হয়। বলে—আচ্ছা মনবরী দিদি, বাজু যদি সুন্দর দেখতে হয় তো কাচনমতীকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো পারে ?

মনবরী ফোঁস করে ওঠে—বেশ বলছ, বায়েন হচ্ছে শুদ্ধ কলিতা বা কায়স্থ। তা ছাড়াও মণ্ড বায়েন গান্ধার বায়েনের মত নাম করা লোকের ছেলে। আর বাজু হচ্ছে হীরা অর্থাৎ কোচ। এককালে ওর মা হাটে হাটে গামলা, হাড়ি বাসন এই সব বিক্রী করে বেড়াত। হীরার ছেলের সঙ্গে যদি সম্পর্ক পাতায় তো বায়েনের বংশের সম্মান থাকবে কোথায় ? আমাদের মত লোকের কথা আলাদা। কোচ আর কলিতার মধ্যে এত কি তফাৎ। বাজু একটা ভেসে বেড়ান ছেলে। জমি-জায়গা নেই। মাত্র সোনাইরপারে একটা ঝুপড়ি ঘর আছে।

মনবরী বাজুর কথা এমনভাবে বলাতে বাসন্তী মনে কষ্ট পায়। ও বলে—আচ্ছা দিদি, ওর জন্য তোমার মায়া লাগে না ?

মনবরী চুপ করে থাকে।

দু সপ্তাহ পরের কথা। মনবরীর বাজুর সঙ্গে একদিন দেখা হয় সোনাইপারে। সে এবার পুরো জমি ভাগে নিয়ে চায করবে। মনবরী ওকে বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু দিন দুই বাদে আবার হৈ হৈ লাগল। কাচনমতীর বালা দুটো মা দেখতে না পেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করাতে কোন কথা বলে না কাচনমতী। বাড়ীতে মারধোর খেল। ওকে নিয়ে বাবা-মার বড় সমস্যা হল। সেদিন থেকেই ওর অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে উঠল। বাইরে থেকে শিকল এঁটে রাখা হল ওকে। ওর শরীর শুকিয়ে যায়। মা বাবা মনে করল যে, ওকে এরকম ভাবে রাখার আগে রাত্রে কোন সময়ে

হয়তো বাজুর সঙ্গে ও দেখা করে। ওর বালা জোড়াও ও নিশ্চয়ই বাজুকেই দিয়েছে।

—বাজুকে বালা দিতে গেল কেন মনবরী ?

—পীরিতের কথা বোঝা বড় দায় দিদি! চাষের ভাগ না দেওয়াতে বাজুর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। সে খাবে কি ? এখনও যদি ভাগে চাষ করবে তো ফসল পাবে কোথায় ? ওর অবস্থা শোচনীয়। এই মাসেই সে তুবার সহরে গেছে। একবার আমি ওকে দলংঘাটে দেখতে পেয়েছি, আরেক বার দেখেছি হাতীচুঙে। সহরে যাওয়া পর্যন্ত ও বালা বেচেই চালাচ্ছিল। সোনাই নদী বছর বছর পলি ফেললে কি হবে ? এখানে ধানের দর বত্রিশ টাকা। এই মৈমনসিঙের লোকেরা পাটের চাষ করতেই হয়তো ধানের দাম বেড়েছে। ওরা আবার চড়া দামে পাট বেচে ধান কিনে খায়।

মনবরী খুব তুঃখের সঙ্গেই কথাগুলো বলে। সোনাইপার কি ছিল আর এখন কি হয়ে গেছে। একসময় এমনি তুধ পেত। তখন তুধ দেবতার ভোগ হয়ে পড়ে। এখানে এখন কেকুয়া ধান এক কিলোও পাওয়া যাচ্ছে না। সোনাইতে সেতু হ'ল। কাঁকর বাঁধানো পাকা রাস্তায় বাস মোটর চলল। অনেকেরই উন্নতি হয়েছে বলে বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু উন্নতি হয়েছে কি ? মানুষের সংখ্যা বেড়েছে শুধু। চাষের মাটিও বাড়েনি। এখন আগের মত চাষীরা ব্যাবসায়ীকে ধান বেচতে পারে না। যারা ধান বেচতে পারে, তাদের আলাদা রোজগারও আছে। দৈচকলার বায়ন বছরে একশ কুইণ্টাল ধান বেচে। ওদিকে তার ছেলে আবার সহরে…। জমির অভাবে সোনাইপারের লোকের অন্য জায়গায় যেতে হচ্ছে। কতকগুলো কাকীতে চলে গেছে। একসঙ্গে এগারেটা খোল বাজাতে পারে, বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে মেয়ে পাগল করতে পারে এমন সব সুন্দর ছেলেরাও সহরে এখন পিয়ন চাপরাশী হয়েছে।

—তা হলে তুমি কি মনে কর ? ওরা এভাবেই কাটাবে ? ওরা

এত দুঃখ সহ্য করবে? বুঝেছ মনবরী, মানুষের জীবনে সুযোগ একবারই আসে। ওদের আর দেরী করা উচিত নয়।

এ কথা বলে বাসন্তী ইস্ ইস্ করল। ওর চোখ সজল হয়ে পড়ে। মনবরীর মনে হ'ল, কাচনমতী আর বাজু সময় বুঝে কাজ না করার দরুনই যেন বাসন্তীর সারা জীবন খাঁচার পাখীর মত দিন কাটাতে হ'ল।

—বাসন্তী, আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখেছি, কাচনমতীর আর ইহজীবনে শান্তি হবে না। ও যমের মত মা বাবার পাল্লায় পড়েছে।

—আমার কিন্তু তা মনে হয় না মনবরী। ওরা একদিন না একদিন পালিয়ে যাবেই। তোর মুখ থেকে শুনলেও আমি তোর চেয়ে ওদের আরও বেশী ভাল করে বুঝেছি।

আরেক দিন মনবরী এসে জানাল যে বাজু কিছু টাকা ধার চেয়ে বেড়াচ্ছে। এক বছর বাদে ও ধার শোধ করবে। উত্তর আসামে নতুন কয়েকটা জায়গায় তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেসব জায়গায় হাজার হাজায় লোক হাজিরা খাটছে। ওরা তেলের পাইপ মাটিতে বসাচ্ছে। রাজমিস্ত্রীও চায়। হাজিরা খাটলেও দিন পাঁচ ছ টাকা করে পাবে। সহরে গিয়ে শুনল যে ও কাজ পাবেই। কিন্তু সেখানে যেতে খরচের দরকার। আমি ভাল করে সব বুঝতে পারছি।

মনবরী বলে—এ সব বুঝিনা দিদি। আমরাও তো একদিন পীরিত করে একজনের সঙ্গে চলে এসেছিলাম। এত ঘোর প্যাঁচ বুঝতে পারিনি। এখনও কিছু বুঝি না।

এক সপ্তাহ পরে যখন মনবরী জানাল যে যে চাবুকধরার ছেলে এসে কাচনমতীকে আংটি পরিয়ে গেছে, আর বৈশাখ মাসের চার তারিখে ওর সঙ্গে বিয়ে, তখনও হতাশ হ'লো বাসন্তী। বাসন্তী বলে—আমার কথা মনে রাখবে দিদি। ওরা পালাবেই। ওরা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

—কি করে বুঝলেন?

—কাচনমতী পাত্রপক্ষের আংটি পরে থাকবে, কেউ ওকে সন্দেহ করবে না। তখন বাবা-মা ভাববে বাজুকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদের

সন্দেহ দূর হবে। ওর উপরে আর কড়া নজর দেবে না তারা। বিয়ে হবে যে মেয়েটার তাকে ওরা আগের চেয়ে বেশী আদর যত্ন করবে। এই সুযোগেই ও পালিয়ে যাবে। আর এমন সুযোগেও যদি না যায়, তবে সারা জীবন পস্তাবে। আমার অবস্থা হবে।

কথাগুলো বাসন্তী এত আবেগের সঙ্গে বলেছিল যে, ও যেন কোন অজানা দেবতাকে ওর মনের ভাব ব্যক্ত করছে। মনবরীর উপস্থিতিটা ও ভুলেই গিয়েছিল একেবারে আর নিজের জীবনের কথাটা হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ থেকে। মুহূর্তের মধ্যেই ও চম্‌কে উঠেছিল। ঠোঁট শুকিয়ে গেল ওর। ও দু'চোখ বুজে ফেলে। মনবরী ওর এই করুণ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়। বাসন্তীর জীবনের আভাস কিছুটা বা অনুমানও করে। বাসন্তীকে ওর অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু পারল না। এমনিতেই তো ওর জীবন দুঃখে ভরা, তার উপর আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে কি লাভ? বাসন্তী শান্তিতে থাক্‌। পরম পুরুষ ওকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখুক। দুঃখ সহ্য করে করে হঠাৎ একদিন শান্তির উৎস খুঁজে পাক্‌।

সেদিন আর বেশী কথা হ'ল না।

পরের দিন বাসন্তী খুব গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—তুই একলা সহরে যেতে পারবি? মনবরী বলে—কেন পারব না? আজকাল বাস মোটরের দিন। সহরে যাওয়া তো সহজ।

—ভাল কথা। একটা জিনিস তোকে সহরে নিয়ে গিয়ে বেচতে হবে। কেন বেচতে চাইছি এই কথা আমায় জিজ্ঞাসা করবি না।

এই কথা বলেই ও শোবার ঘরে ঢুকল। বাক্সের থেকে দুটো বালা এনে মনবরীর হাতে দেয়। কোথায় এবং কেমন করে বেচতে হয়, তারও উপায় বলে দেয়। জেলায় অশ্বত্থ গাছের কাছে একটা লাল টিনের ছাউনি দেওয়া স্কুল আছে। সেখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই একটা স্যাকরার দোকান। মনবরীর মত মেয়ে এত সুন্দর একটা বালা বেচতে নিয়ে ধরা পড়ার কোন ভয় নেই। সেই স্যাকরাটা চোরাই মালই কেনে।

দিন দুয়েক পরে মনবরী বালা বেচে নিয়ে এসে টাকা দিল। ও আরও জানায় যে বাজু টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথাও তার টাকার যোগাড় হচ্ছে না।

মনে হ'ল বাসন্তী শান্তি পেয়েছে। ও আগের মতই গম্ভীর হয়ে বলে, পিছনের দিকের বাগানের সব্জীগুলো পেকে গেল। এইটুকু জায়গা কুপিয়ে আদা, হলুদ রুইতে পারলে ভাল হ'ত। তুই এই কথাটা শ্বশুর মশায়কে বলিস্। তিনি তখন একটা লোকের কথা বলবেন হয়তো। আর সে সময়ে তুই মাটি কোপাবার জন্য বাজুকে ডেকে আনিস্। আমার তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখতেও ইচ্ছে হচ্ছে।

পিছন দিকের বাগানটা কোপাবার জন্য এল বাজু। বাজুর সঙ্গে বাসন্তী কথা বলল। গোড়ায় বাজু বিশ্বাসই করতে পারেনি যে পৃথিবীতে এত স্নেহপ্রবণ মানুষ আছে।

বাজু লজ্জা পেয়ে কিছু বলে না। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করে—উত্তর আসামে কখন যাবি ?

—কিছু ঠিক করিনি। অনেক টাকা লাগবে। এই কদিন চলারই পয়সা নেই। কিন্তু যে করে হোক বৈশাখের আগে যেতেই হবে।

—ওকেও তো সঙ্গে নিবি ?

—ভাবছি।

বাসন্তীর মনটা আশায় ভরে ওঠে। তার পরেই ওদের কথাবার্তা সহজ হয়ে পড়ে। বাসন্তীর সামনে বাজু চোখের জল ফেলে। মনবরী দূর থেকে ধরতে পারে না। মনবরী মনে করে বাসন্তী হয়তো ওর অতীত জীবনের কথা বাজুর কাছে বলে শোক হাল্কা করছে। কারণ বালা বেচে পেয়েছিল তিন কুড়ি দশ টাকা সেই টাকা বাজুর হাতে দেওয়ার সময় বাসন্তী ওকে বলেছিল—যত তাড়াতাড়ি পারিস কর। বুঝলি বাজু, জীবনে সুযোগ একবারই আসে। আমার মত সুযোগ হারানো মেয়ে আর কোথায় আছে ?

বাজু বিকেলে চলে গেল। মনবরীর বাসন্তীর বিষয়ে খুবই কৌতূহল হ'ল। কোন কিছু না জানার ভাণ করে বলে—আজ ওরা দুজনে পালিয়ে গেলে তাতে আপনার কি লাভ?

বাসন্তী গম্ভীর হয়ে বলে—লোকে শুধু কি লাভ লোকসান দেখেই কাজ করে? ওদের কথা শোনার পর থেকেই ভাবছিলাম, ঈশ্বর ওদের ভাল করুন। আর ওরা দুজনে যাতে পালিয়ে যায় সেটাই আমি চাই।

বৈশাখ মাস অবধি ওরা আর অপেক্ষা করল না। ফাল্গুনের চার দিন পার হতেই মণ্ড বায়েনের চোখে ধূলো দিয়ে কাঞ্চনমতী বাজুর সঙ্গে কোথায় পালিয়ে গেল। মনবরীর ভাষায়, সোনাইর মাছকচ্ছপ টের পেল না, ওরা মাঝ রাত্তিরে সোনাই পার হ'ল। লোকেরা কেউ কিছু জানতে পারল না। ওরা কোথায় গেল সে কথা কেবল বাসন্তী ও মনবরী জানে। বাসন্তীর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

কাচনমতী পালাবার পর থেকে বাসন্তীর মনে অনেক পরিবর্তন এল। আগে ও দুঃখ সহ্য করত নীরবে। এখনও আবার অস্থির হয়ে পড়ে। আবার ধনঞ্জয়ের চিন্তা ওকে তোলপাড় করল। ও এইবার ভাবল, এবারে আগের চেয়েও কঠোর হতে হবে। নিজের সুনামের কথা ভাবলে ওর চলবে না। ওর শ্বশুর শাশুড়ীর মায়া ছাড়তে হবে।

মনবরীর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আগের চেয়েও গভীর হয়। বাসন্তীর দৃঢ় ধারণা মনবরী খুবই বিশ্বাসযোগ্য এবং বাসন্তীকেও ও ভালবাসে। একদিন আবেগভরে মনবরীকে ও নিজের সব কথা বলে। মনবরীর কাছে আর কোনো সঙ্কোচ রাখল না। মথুরাকেও ও একদিন সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু সবটা বলেনি। এখন আর একজনের কাছে সব সত্যি কথা বলে ওর মনের বোঝা হাল্‌কা করল। মনবরীও বাসন্তীর ইচ্ছাকেই সমর্থন করে।

—মনবরী, তুই ওঁকে চিনিস?

—আমি চিনি, উনি কিন্তু আমায় চেনেন না।

—তাহলে একটা কাজ কর। আমি একখানা চিঠি দেব। তুই যে করে হোক ওঁর হাতে পৌঁছে দিস। দেখবি আবার, কেউ টের না পায়।

মনবরী কথা দেয়। ও গাঙচিলায় গিয়ে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একলা দেখা করে, বাসন্তীর বিষয়ে সব কথা বলে। ধনঞ্জয় চিন্তায় পড়ে। মনবরীর দেওয়া চিঠিখানা বারে বারে পড়তে থাকে।

প্রিয় ধনঞ্জয়,

শেষবার দেখা হতেই বুঝেছি, তুমিও আমার মত খুবই যন্ত্রণা পাচ্ছ। মনবরীর কাছ থেকে আমার সব কথা শুনতে পাবে, আমাদের বুড়ো হতে এখনও অনেক দেরী। অনেক দিন বেঁচে থাকতে হবে। আমরা জীবনের বাকী দিনগুলো কি করে কাটাব। এর কি কোন প্রতিকার নেই ? অনেক পুঁথি পড়েছি। তবুও পর জন্মের পুণ্য সঞ্চয়ে আমার বিশ্বাস হল না। যে ঈশ্বর ইহজন্মে এত কষ্ট দিচ্ছেন, এত নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন, সেই ঈশ্বরই পরজন্মে সুখ দেবেন, তার কি বিশ্বাস ? বুঝেছি, আমি তো তোমারই হতে চলেছি শুনলে লোকে মুর্ছা যাবে। কিন্তু···।

সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছিল ধনঞ্জয়। শেষ বার যে বাসন্তীকে এত সহনশীল মনে হয়েছিল, যে বাসন্তী মনের দারুণ অবস্থাতেও হিন্দুর বিধবা বৌ বলে গর্ববোধ করেছিলে আর মনের ব্যথা বেদনাকে আজীবন বয়ে বেড়ানর প্রতিশ্রুতি যার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল ; সেই বাসন্তীরই মনের অকস্মাৎ পরিবর্তন, দুর্দান্ত সাহস, সামাজিক মূল্যবোধকে তুচ্ছ করার প্রবল ইচ্ছা এবং তার সঙ্গে থাকার জন্য যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে তার আভাস পেয়ে ও উভয় সংকটে পড়ে। হতের মধ্যে চিঠিখানা কাঁপতে থাকে। কপালে ঘাম দেখা দিল ধনঞ্জয়ের। মনবরীকে ও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। কিছুক্ষণ ওর দেহমন অবশ হয়ে থাকে।

এক অজানা আশঙ্কা মনবরীকে অস্থির করে তোলে। শেষে ধনঞ্জয় আস্তে আস্তে বলে আমি আজ চিঠির উত্তর দিচ্ছি না। তুই

বলিস গিয়ে—আমি ভেবে দেখি। কি করা যায়। এ সম্বন্ধে আমি দরগুিয়ালে নিজে গিয়ে কথা বলব। পরশু সেখানে যাব।

মনবরী বাসন্তীকে সব কথা বলে। বাসন্তীর চিন্তা আরও বেড়ে যায়। শেষে কি তা হলে সেই অপমানিত হবে? ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই ভেবেছে বাসন্তী স্বার্থপর ও চরিত্রহীনা।

দু'দিন দু'রাত বাসন্তীর আহার নিদ্রা নেই। ওর কথা অনুযায়ী ধনঞ্জয় কিন্তু আর এল না বাসন্তীর কাছে। সেজন্যে বাসন্তীকে কিছু না বলেই মনবরী গাঙচিলায় যায় আর সব কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। সোনাই-এর উত্তরপারের লোকেরা যাকে দেবতা জ্ঞান করত সেই ধনঞ্জয় বরুয়া নিজের ঘরটা মাছের ব্যবসায়ী একজনকে বিক্রি করে দিয়ে কোথায় চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারে না। সে কাউকে কিছু বলে যায়নি। শুধু গাঙচিলার গ্রামের মোড়লকে এই কথা জানিয়ে গেছে যে সেখানে বা সোনাই পারে সে আর কোন দিন আসবে না।

মনবরী ভেবেছিল এই খবর পেয়ে মূর্ছা যাবে বাসন্তী। কিন্তু কথাটা শুনে ও কেবল একবার আকাশের দিকে তাকাল। ওর চোখে আকাশটা যেন হলদে হয়ে যায়। ওর চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করছে শুধু। মনবরীকে কিছু না বলে নিঃশব্দে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে সে দরজায় খিল দেয়।

এর পর থেকে বাসন্তী আর কথা বলত না মনবরীর সঙ্গে। আগের মতই আবার নীরব, নির্বাক। শ্বশুর মশায়ের কেনা পুঁথি পুরাণগুলো এতদিনে ঘরের চালে উঠিয়ে রেখেছিল, সেগুলো আবার টেনে নামিয়ে আনে নিজের ঘরে। গাঙচিলের ডানায় ছয় ঋতুর রঙ লাগে। জীবনের স্পন্দন অনুভব করার জন্য ও ঘন ঘন ডানা ঝাপটায়। সোনাইর জলে গাঙচিল ছোঁ মেরে যায় মাছের সন্ধানে। নদীতে মাছগুলো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।

গাঙচিলের ডানার বাতাস লেগেছে বাসন্তীর গায়েও। ও কিন্তু স্থির হয়েই বসে থাকে। রূপসী সোনাই আগের মতই বইছে।